কৃষ্ণ-সূর্যসম, মায়া হয় অন্ধকার! যাহা কৃষ্ণ,তাহা নাহি মায়ার অধিকার!!
অমৃতের সন্ধানে
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন রক্ষা করার ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের উদ্বেগ তাঁর ভক্তদের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর কাছে তারা ছিল পার্থিব বিষয়ে অনভিজ্ঞ শিশু; পাষণ্ডীদের সঙ্গে যে কিভাবে আরচণ করতে হয় তা তারা জানত না এবং তারা সহজেই প্রতারিত হত। কিন্তু পুত্ররা যদি প্রতারিত হয় তা হলে পরিবার রক্ষা করার জন্য পিতাকে অবশ্যই চতুর এবং দৃঢ় হতে হয়। শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠান এবং তাঁর ভক্তদের রক্ষকরূপে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর শিষ্যদের বসবাসের জন্য সুন্দর বাড়ি তৈরি করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন করে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে পারে। শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরও এই শিক্ষা দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন যে কৃষ্ণভাবনামৃতের প্রচারকেরা সব চাইতে ভাল জিনিসগুলি পাবে, কেন না তারা শ্রীকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ সেবা করছে। শ্রীল প্রভুপাদ তাই বোম্বাই শহরে হরেকৃষ্ণ নগরী প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর মনোভাব একজন উলঙ্গ সাধুর মত ছিল না, যিনি জড় জগতের সব কিছুর প্রতি উদাসীন। তিনি তাঁর হাজার হাজার শিষ্যের দায়িত্ব অনুভব করেছিলেন, এবং তাই তাঁকে এত উদ্বেগের বোঝা বহন করতে হয়েছিল।
কি উদ্দেশ্য যে শ্রীল প্রভুপাদকে প্রণোদিত করছে তা শ্রীযুক্ত 'এন্' জানতেন না। আর শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের বিরুদ্ধাচরণ করার ফল যে কি তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি, যদিও তা করলে যে কি বিপদ হতে পারে সেকথা ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ আদি ভারতবর্ষের সমস্ত শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষ অবলম্বন করে লড়াই করেছিলেন; তাই শ্রীযুক্ত 'এন্' পরম ঈশ্বর ভগবানের বিপক্ষ অবলম্বন করেছিলেন।
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন)-এর
প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অমৃতের সন্ধানে

ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

(কেবলমাত্র সদস্যদের জন্য)

দ্বাদশ বর্ষ ▶ প্রথম সংখ্যা ▶ জানুয়ারী ▶ ফেব্রুয়ারী ▶ মার্চ ২০০৭ ইং

প্রতিষ্ঠাতা ঃ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্‌কন) এর প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের নির্দেশানুসারে, বাংলাদেশ ইস্‌কন গভর্নিংবডি কমিশনার ও গুরুবর্গের কৃপায়

সম্পাদক ঃ শ্রী চারু চন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী
নির্বাহী সম্পাদক ঃ শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ দাস ব্রহ্মচারী
সহকারী সম্পাদক ঃ শ্রী অজিতেষ কৃষ্ণ দাস

বাংলাদেশ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রধান উপদেষ্টা ঃ শ্রী ননী গোপাল সাহা
বিশেষ উপদেষ্টা ঃ শ্রী সত্যরঞ্জন বাড়ৈ, নবনিযুক্ত ডি আই জি (অবসরপ্রাপ্ত)
পৃষ্ঠপোষকতায় ঃ শ্রী চিত্ত রঞ্জন পাল
শ্রী সুদর্শন কৃষ্ণ দাস
স্বত্বাধিকারী ঃ ইস্‌কন ফুড ফর লাইফ
ভিক্ষা মূল্য ঃ প্রতিকপি-২০.০০ টাকা
এবং বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা
১। সাধারণ ডাকে – ৯০.০০টাকা
২। রেজিঃ ডাকে – ১১০.০০টাকা
গ্রাফিক ডিজাইন ঃ প্রসেনজিৎ রাজবংশী ভক্ত

❀ সূচীপত্র ❀

✳ যোগাযোগ করুন ✳

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
স্বামীবাগ আশ্রম
৭৯, ৭৯/১, স্বামীবাগ রোড, ঢাকা- ১১০০
ফোন ঃ ৭১২২৪৮৮, ০১৭১৫৭৯১২৬৪

'ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে'
শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির
৫ চন্দ্রমোহন বসাক ষ্ট্রীট, বনগ্রাম (ওয়ারী)
ঢাকা- ১২০৩, ফোন ঃ ৭১১৬২৪৯

❈ প্রচ্ছদপট ❈

শ্রীমতি সীতা ঠাকুরাণী নানাবিধ আহার্য-বসন-ভূষণাদি নিয়ে শচীমাতার গৃহে এলেন। নবজাত শচীপুত্রকে দেখে তিনি অত্যন্ত আশ্চার্যান্বিত হলেন, কারণ তিনি দেখলেন শিশুটি অঙ্গবর্ণ ব্যতীত হুবহু গোকুলের কৃষ্ণের মতো।

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

একাদশী ব্রত তালিকা-২০০৭

গৌরাব্দ ঃ ৫২০-৫২১ ; বঙ্গাব্দ ঃ ১৪১৩-১৪১৪ ; খ্রীষ্টাব্দ ঃ ২০০৭

তারিখ	বার	একাদশীর নাম	পারণের সময়
১৫.০১.০৭	সোমবার	ষট্‌তিলা	পরের দিন ০৬.৪৩ - ১০.১৯ এর মধ্যে
২৯.০১.০৭	সোমবার	ভৈমি	পরের দিন ০৬.৪০ - ১০.২১ এর মধ্যে
১৪.০২.০৭	বুধবার	বিজয়া	পরের দিন ০৬.৩২ - ১০.১৯ এর মধ্যে
২৭.০২.০৭	মঙ্গলবার	আমলকী ব্রত	পরের দিন ০৬.২২ - ১০.১৫ এর মধ্যে
১৫.০৩.০৭	বৃহস্পতিবার	পাপমোচনী	পরের দিন ০৬.০৭ - ১০.০৭ এর মধ্যে
২৯.০৩.০৭	বৃহস্পতিবার	কামদা	পরের দিন ০৫.৫৩ - ১০.০০ এর মধ্যে
১৪.০৪.০৭	শনিবার	বরুথিনী (ত্রিস্পৃশ্যা মহাদ্বাদশী)	পরের দিন ০৫.৩৮ - ০৯.৫২ এর মধ্যে
২৮.০৪.০৭	শনিবার	মোহিনী (উন্মিলনী মহাদ্বাদশী)	পরের দিন ০৫.২৬ - ০৮.৪৪ এর মধ্যে
১৩.০৫.০৭	রবিবার	অপরা	পরের দিন ০৫.১৭ - ০৯.৪২ এর মধ্যে
২৭.০৫.০৭	রবিবার	পদ্মিনী	পরের দিন ০৫.৩৭ - ০৯.৪১ এর মধ্যে
১১.০৬.০৭	সোমবার	পরমা	পরের দিন ০৫.১১ - ০৯.৪২ এর মধ্যে
২৬.০৬.০৭	মঙ্গলবার	পান্ডবা (নির্জলা)	পরের দিন ০৫.১৪ - ০৯.৪৫ এর মধ্যে
১১.০৭.০৭	বুধবার	যোগিনী	পরের দিন ০৫.১৯ - ০৯.৪৯ এর মধ্যে
২৬.০৭.০৭	বৃহস্পতিবার	শয়ন	পরের দিন ০৫.২৬ - ০৮.০৫ এর মধ্যে
০৯.০৮.০৭	বৃহস্পতিবার	কামিকা	পরের দিন ০৫.৩২ - ০৭.০০ এর মধ্যে
২৪.০৮.০৭	শুক্রবার	পবিত্রারোপন	পরের দিন ০৫.৩৮ - ০৯.৫৩ এর মধ্যে
০৭.০৯.০৭	শুক্রবার	অন্নদা	পরের দিন ০৫.৪২ - ০৯.৫২ এর মধ্যে
২৩.০৯.০৭	রবিবার	পার্শ্ব	পরের দিন ০৫.৪৮ - ০৯.৫০ এর মধ্যে
০৬.১০.০৭	শনিবার	ইন্দিরা	পরের দিন ০৫.৫২ - ০৯.৪৮ এর মধ্যে
২২.১০.০৭	সোমবার	পাশাঙ্কুশা	পরের দিন ০৫.৫৯ - ০৯.৪৮ এর মধ্যে
০৫.১১.০৭	সোমবার	রমা	পরের দিন ০৬.০৭ - ০৯.৫০ এর মধ্যে
২১.১১.০৭	বুধবার	উত্থান	পরের দিন ০৬.১৭ - ০৭.৪২ এর মধ্যে
০৫.১২.০৭	বুধবার	উৎপন্না	পরের দিন ০৬.২৭ - ১০.০২ এর মধ্যে
২০.১২.০৭	বৃহস্পতিবার	মোক্ষদা	পরের দিন ০৬.৩৬ - ১০.০৯ এর মধ্যে

❀ ইস্‌কন মুখপত্র- ত্রৈমাসিক 'অমৃতের সন্ধানে'
পত্রিকাটি পড়ুন এবং এর গ্রাহক হয়ে আপনার মানবজীবনকে ধন্য করুন। ❀

পাপমুক্তির সরল পন্থা

১১ নভেম্বর ১৯৭৩ দিল্লিতে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভাগবত (১/২/৫-৬) প্রবচন থেকে সংকলিত

-শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি ॥

যয়াত্মা সুপ্রসীদতি। প্রত্যেকের সুখের সন্ধানে ছুটে চলেছে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। জীবনের দুর্বিষহতা কমাতে আর আনন্দ উপভোগ বাড়াতেই মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রাম; আমরা জীবাত্মা সকলেই শ্রীভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। মমৈবাংশো জীবভূতঃ। সমস্ত জীবমাত্রই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের কথা বলি, তখন ভগবানকেই বুঝি। ভগবানের হাজার হাজার নাম আছে, কিন্তু এই নামটি প্রধান। 'কৃষ্ণ'মানে সর্বাকর্ষক; শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই আকর্ষণ করে থাকেন। কিংবা বলা চলে, যিনি প্রত্যেককে আকর্ষণ করেছেন, তিনিই ভগবান। কিছু লোকের যা কিছু জীবের প্রতি কেবল ভগবানের আকর্ষণ, এবং অন্য কাউকে আকর্ষণ করেন না, ভগবান এমন নন। ভগবানের সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র শৌর্য বীর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র বৈরাগ্য দিয়ে তিনি সর্বাকর্ষক হয়ে রয়েছেন। এই সমস্ত গুণাবলী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেই একমাত্র দেখতে পাওয়া যাবে।

ঐশ্বর্যস্য সমগ্রস্য বীর্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষন্নাং ভগইতীঙ্গনা ॥

ভগ মানে ঐশ্বর্য, শ্রী। যেমন, কখনও আমরা বলি 'ভগবান'। সেটা এসেছে এই 'ভগ' শব্দ থেকে। তাই ভগবান মানে যিনি সমগ্র ঐশ্বর্যবান। তাঁকে বলা হয় ভগবান। আজকাল তো অনেক অনেক ভগবান উঠেছে, কিন্তু তারা কেউ সমগ্র ঐশ্বর্যের অধিকারী নয়। হয়ত খানিকটা থাকতে পারে। কিন্তু 'ভগবান' মানে সমগ্রস্য। অর্থাৎ সম্যক্ সম্পূর্ণ।

কোনও ধনী লোক দাবি করতে পারে, "আমি এত কোটি টাকার মালিক।" আরও একজন বলে উঠতে পারে,"না, আপনার চেয়ে আমার আরও দু-এক কোটি টাকা বেশি আছে।"আবার অন্য অনেকে অনেক বেশি বলতেও পারে- এমন তো চলতেই পারে।

কিন্তু কেউ দাবি করতে পারে না যে "আমি সমগ্র ঐশ্বর্যের মালিক।" তবে ভগবদ্‌গীতায় দেখবেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দাবি করছেন, ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্। সর্বলোকমহেশ্বরম্ মানে "সকল গ্রহলোকের পরম অধিকারী।" শাস্ত্রে তা অনুমোদিত হয়েছে।

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হয়েছে, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ। ঈশ্বর মানে নিয়ন্তা অর্থাৎ শক্তিমান নিয়ন্ত্রণকারী। যেমন, দেশের রাষ্ট্রপতি কিংবা রাজা। অনেক ঈশ্বর অর্থাৎ নিয়ন্তা আছে। আপনিও ঈশ্বর, আমিও ঈশ্বর। কারণ আপনি তো অন্তত আপনার পরিবারবর্গের সবাইকে কিংবা কয়েকটি পালিত পশুকেও
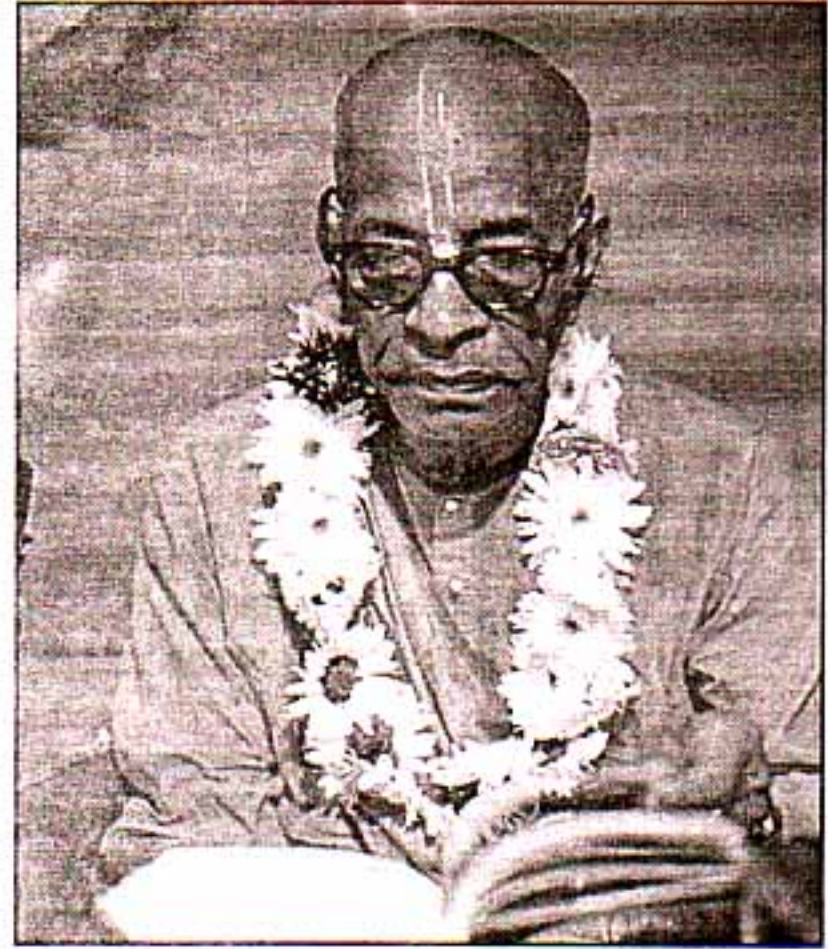
নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। তাই এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে, কারণ আমরা পরম নিয়ন্তা, শ্রীকৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু আমরা তো পরম নিয়ন্তা নই। আমরা কয়েকটি জীবসত্তার নিয়ন্তা হতে পারি, কিন্তু আমরাও তো অন্য এক পরম শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। অতএব আমরা পরম নিয়ন্তা নই। আমরা আপেক্ষিক নিয়ন্তা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে-ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ। পরমঃ মানে সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি প্রত্যেককে অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসকে নিয়ন্ত্রণ করেন, কিন্তু তিনি কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন না। তাঁকেই বলে ঈশ্বরঃ পরমঃ। আমরাও ঈশ্বর, আমাদের নিজ সীমানার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করে থাকি, কিন্তু আমরাও অন্য কারও দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছি। এটা বুঝতে চেষ্টা করুন ভালভাবে। তবে শ্রীকৃষ্ণের জীবনে দেখবেন যে, তিনি প্রত্যেককে নিয়ন্ত্রণ করছেন, কিন্তু তিনি কারও কাছে নিয়ন্ত্রিত হন না। তাই তাঁকে বলা হচ্ছে **"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।"**

তাঁর নিজ রূপ আছে। ভগবানের আকার আছে। মায়াবাদী দার্শনিকেরা মনে করে-পরম তত্ত্বের বিশেষ রূপ নেই, নির্বিশেষ। তারা শূন্যবাদী । না। পরম তত্ত্ব 'শূন্য' হতে পারে না বা নির্বিশেষ হতেও পারে না, কারণ তিনি তো নিয়ন্তা, নিয়ন্তার অবশ্যই মস্তিষ্কে বুদ্ধি আছে। মস্তিষ্কে বুদ্ধি না থাকে তো কিভাবে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন? আর, মস্তিষ্ক যখন আছে, তা হলে মস্তিষ্কের নির্দেশ মেনে কাজ করবার উপযোগী দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গও নিশ্চয়ই থাকছে। তাই, যখনই আপনার

ইন্দ্রিয়াদি আপনি লাভ করছেন, যখনই আপনি ইন্দ্রিয়াদির উপযোগী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি পাচ্ছেন, যখনই আপনি একটি মস্তিষ্ক অর্জন করছেন, আর যখনই সেই মস্তিষ্ক কাজে লাগিয়ে ইন্দ্রিয়াদি হাত পা চালাতে হবে, তবেই মানুষ নামের পদবাচ্য হওয়া যেতে পারে। এটাও শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত।

অতএব পরম নিয়ন্তা নির্বিশেষ হতে পারেন না। বাস্তব জীবনেই তো আমরা দেখছি, সরকার হয়েছে। 'সরকার'একটি নৈর্ব্যক্তিক শব্দ হতে পারে না। বাস্তব জীবনে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি দেশের গভর্ণর আছে, তিনি কোনও একটি লোক। লোক তো চাই-যে মস্তিষ্ক কাজে লাগিয়ে সবকিছু করবে। তা হলে এটা কেমন করে হতে পারে যে, মস্তিষ্ক নেই অথচ সারা বিশ্বজগৎ নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছে? সেটা তো খুব যুক্তি সঙ্গত কথা হল না। আর সেই কথাটা তো শাস্ত্রসম্মতও নয়।

শাস্ত্র অনুসারে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরম সত্যকে 'তত্ত্বজ্ঞান' বলে বোঝানো হয়েছে। তত্ত্ব মানে সত্য। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন, তত্ত্ববিদঃ। তত্ত্ব মানে সত্য। "যিনি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন.."

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে ॥

(ভাঃ ১/২/১১)

"পরমতত্ত্বজ্ঞান যাঁদের সত্যই আছে, তাঁরা জানেন যে, পরম তত্ত্বের প্রকাশ ঘটে তিনটি সংজ্ঞায়-নির্বিশেষ ব্রহ্ম, পরমাত্মা, অন্তর্যামী বা পরমাত্মা এবং ভগবান।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, প্রত্যেক দেহে আত্মা রয়েছে, ক্ষেত্রজ্ঞ। ইদং শরীরং ক্ষেত্রম্ ইত্যভিধীয়তে। আমি এই শরীরটি নই, কিন্তু আমি জেনেছি এটাই আমার শরীর। অতএব আমি ক্ষেত্র-জ্ঞ আর শরীরটি হল ক্ষেত্র। আর শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত। ঐ যে সর্বক্ষেত্রেষু ভারত প্রত্যেকের শরীরমধ্যে রয়েছেন, ভগবানের সেই অভিপ্রকাশ হলেন শ্রীকৃষ্ণ পরমাত্মা রূপে। একটি গাছের সঙ্গে এটির তুলনা করা চলে। একটি গাছে যেন দুটি পাখি বসে আছে। একটি পাখি ফল খাচ্ছে আর অন্যটি শুধুই দেখছে। উপদৃষ্টা অনুমন্ত।

তা, এই হল বৈজ্ঞানিক কথা। তাই মানব জীবনে এই পারমার্থিক বিজ্ঞান চর্চা, এই বিজ্ঞান উপলব্ধি করতে মানুষে চায়। মানুষের জীবনই সেই জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। পরম বিজ্ঞান এই তত্ত্ব কথা। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। মানব জীবনটা কুকুর বেড়ালের মতো অপব্যবহার করার জন্য হয়নি-কেবল আহার, নিদ্রা, মৈথুন নয়। ওটা মানুষের জীবনধারা নয়। এই মুহূর্তে মানুষ কেবলই তার জীবনে দেহটির দাবি মেটাতেই চারটি জড়জাগতিক অভ্যাসে সংশ্লিষ্ট হয়ে রয়েছে-আহার, নিদ্রা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি আর কিভাবে নিজেকে বাঁচাতে হয়, আত্মরক্ষা করতে হয়।

দূর্ভাগ্যের বিষয়, আমরা পশুদের চেয়েও অধম হয়ে পড়ে আছি, কারণ পশুদের কোনও সমস্যাই নেই। ৮৪ লক্ষ জীবযোনির মধ্যে মানবযোনি মাত্র ৪ লক্ষ। বেশির ভাগ জীবই হচ্ছে অন্যান্য আকৃতির।

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
ক্রিময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষণম্ ॥

জলজ প্রাণিরা আছে, কীট পতঙ্গ রয়েছে, পশুপাখি গাছপালা, সব শেষে মানুষ-বিবর্তনের ক্রমান্বয়ে হয়েছে। অন্য যোনিজ প্রাণিদের কোন সমস্যা নেই। দেখতে পাচ্ছেন-ভোরবেলা এই সব পাখিগুলি নাচে, গায়-ওদের কোনই সমস্যা নেই। এক্ষুণি কোনও গাছে যাবে, ফল খাবে-খাওয়ার সমস্যা নেই। ঘুমের সমস্যা নেই, যৌন জীবনেরও সমস্যা নেই। নারী পুরুষ পরস্পরকে বাঁচাতে খুব চেষ্টা করে থাকে নিজেদের বুদ্ধিমতো। এগুলি সমস্যাই নয়। শরীরের প্রয়োজনে এগুলির সমাধান হয়েই যাবে। এটাই শাস্ত্রের বচন।

তল্লভ্যতে দুঃখবৎ অন্যতঃ সুখং কালেন সর্বত্র গভীর রংহসা। যার যার শরীর অনুসারে, আহার সমস্যা, নিদ্রার সমস্যা, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সমস্যা এবং আত্মরক্ষার সমস্যার সমাধান হয়েই রয়েছে। শাস্ত্রের তাই বচন। আপনাদের প্রকৃত সমস্যা হল জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির কালচক্রটির সমস্যা কিভাবে সমাধান করা চলে। সেটাই আপনাদের সমস্যা।

তাই মানব সমাজে, কিছু ধর্ম-সংস্কৃতির ব্যবস্থা আছে, যার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলির সমাধান হয়। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষ এমনই বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, তারা যথার্থ সমস্যার কথা ভাবছে না, কিন্তু তারা অনিত্য সমস্যাদি নিয়ে বড়ই ব্যতিব্যস্ত হয়ে রয়েছে-

যেগুলির সমাধান হয়েই রয়েছে। আমরা কেবল সেইগুলির অব্যবস্থা ঘটাচ্ছি।

তাই জীবনের সমস্যাদির সমাধান করবার যে পদ্ধতি তাকে বলা হয় ধর্ম। ধর্ম মানে বিধিবদ্ধ জীবনধারা যা ভগবান দিয়েছেন মানব সমাজকে। এটা আমি বহুবার বুঝিয়েছি। ঠিক যেমন রাষ্ট্রের মধ্যে জনগণের জীবনধারা বিধিবদ্ধ নীতির মাধ্যমে গড়ে উঠে, এবং তার জন্য রাষ্ট্রের আইনকানুন থাকে, তেমনি মানব সমাজও বিধিবদ্ধ নিয়মনীতিকে বলে ধর্ম। মানুষের জীবন সার্থক করার জন্যই তা দরকার।

সার্থক জীবন কাকে বলে? মানুষের সার্থক জীবন বলতে বিবর্তনের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই মানব রূপটি লাভ করেছে। এখনই তাকে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধির আবর্ত থেকে সে মুক্ত হয়ে উচ্চতর গ্রহলোকে উন্নত জীবন যাপনের অধিকার লাভ করতে পারে। সেটি ভগবদ্গীতায় বোঝানো আছে-

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্ ॥

(গীতা ৯/২৫)

এই হল মানব জীবন। জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধির আবর্ত থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের দুর্বিষহ অবস্থার স্থায়ী সমাধানের জন্য উচ্চতর জীবনধারার উপযোগী করে নিজেকে গড়ে নিতে হবে। এটাই বাঞ্ছনীয়। এটাই মানুষের কাজ, অর্থাৎ ধর্ম।

তা হলে কিভাবে সেই ধর্ম আয়ত্ত করা যাবে? ধর্ম মানে বৃত্তিমূলক কর্তব্য পালন। ধর্ম একটা ভাবাবেগের ব্যাপার নয়। বস্তুত আজকাল মানুষ ধর্মকে মনে করে একটা বিশ্বাস মাত্র।

কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে সেইভাবে বর্ণনা দেওয়া আছে। বিশ্বাস তো আমরা বদলাতে পারি। আজ হিন্দু, কাল মুসলমান বা আজ মুসলমান তো কাল ক্রিশ্চান। বিশ্বাস বদলাতেই পারা যায়। কিন্তু সেটা ধর্ম নয়। বিশ্বাস বদলানো বা বিশ্বাস গ্রহণ করা, ধর্ম নয়। ধর্ম মানে যা আপনি বদলাতে পারেন না। এমন কি হিন্দু থেকে মুসলমান বা মুসলমান থেকে ক্রিশ্চান হয়ে যেতে পারেন, তবু বৃত্তিমূলক কর্তব্য বদলাতে আপনি পারেন না।

ধরুন, আপনি সরকারি কর্মী। একটা সরকারি দফতরে কাজ করছেন। কিন্তু কাল হিন্দু বা মুসলমান বা ক্রিশ্চান হয়ে গেলেন। তবে তাতে কি আপনার সরকারি চাকরিও বদলে যাবে? না। সেটা চলতে থাকবে।

তা হলে আসল কাজ বলতে বোঝায় কাউকে সেবার কাজ। সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু-জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণ দাস। আমাদের প্রকৃত কাজ, প্রকৃত বৃত্তি হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা। সেই সেবা মনোভাব নেই, কারণ আমরা ভগবানকে ভুলে আছি। আমরা অন্য জনেদের সেবা করছি। ওটা হল মায়া। সেবা আমাদের করতেই হবে। কেউ বলতে পারে না-"আমি কারও সেবা করি না। আমি স্বাধীন।" তা সম্ভব নয়। আপনাকে সেবা করতেই হবে। আর সেই সেবাই হল ধর্ম।

যেমন, নুন্ নোনতা স্বাদের হয়, চিনি মিষ্টি স্বাদের। মিষ্ট স্বাদটি চিনির ধর্ম। লঙ্কার ঝাল তার ধর্ম। এটা বদলাতে পারে না। চিনি নোনতা হলে আপনি তা নেন না। "আরে, এটা তো চিনি নয়।" তেমনি, জীবের নিত্য বৃত্তি রয়েছে। "আরে, এটা তো চিনি নয়।" তেমনি, জীবের নিত্য বৃত্তি রয়েছে। সেটি সেবা বৃত্তি। সেই সেবাকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে-'পরিবারের সেবা', 'দেশের সেবা', 'সমাজ সেবা', 'জাতির সেবা', 'মানবতার সেবা'-এমনি কত নাম আছে। কিন্তু সেবা আছেই। তবে এই সমস্ত সেবা সম্পূর্ণ হতে পারে না ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পারমার্থিক সেবাকার্য সম্পন্ন না হলে। তাতেই সেবার সার্থকতা। আর সে-ই হল ধর্ম। ধর্ম কাকে বলে এ থেকে তা বুঝতে চেষ্টা করবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল সূত গোস্বামী নৈমিষারণ্যে সমবেত মুনি সমাবেশে শৌনক মুনির প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন-পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম ধর্ম সংস্থাপনার্থায়। তাই মুনিদের জিজ্ঞাসা ছিল-"শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকটলীলার পরে, ধর্মের পালন কিভাবে হবে, কার কাছে?" আর "ধর্ম প্রকৃতভাবে কি?"এখানে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। -স বৈ পুংসা পরোধর্মঃ। পরঃ মানে শ্রেষ্ঠ। এই ধর্ম, সেই ধর্ম, হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, ক্রিস্টান ধর্ম কিংবা আরও কত ধর্ম রয়েছে। সবই ধর্ম। ও সব অনিত্য। কিন্তু পরো ধর্ম মানে নিত্য ধর্ম, শাশ্বত ধর্ম বা সনাতন ধর্ম। তাকে বলে পরা। পরা মানে শ্রেষ্ঠ।

তাই স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতোভক্তিরধোক্ষজে। অধোক্ষজ মানে ভগবান। অধঃ মানে নিম্নমুখী। অক্ষজ মানে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অধোক্ষজ মানে প্রত্যক্ষ ধারণা। প্রত্যক্ষ ধারণায় ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে ভগবানকে দেখতে চাইলে দেখা যাবে না। চোখ তৈরি করা চাই। এর জন্য শ্রুতির মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। শ্রবণ অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

শ্রবনং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যম্ আত্মনিবেদনম্ ॥

এই হল পদ্ধতি। শ্রবণ মাধ্যমে শুরু করতে হয়। যদি শুধুমাত্র শ্রবণ মাধ্যমে ভগবানের কথা শোনা যায়, তাহলে শ্রবণের মাধ্যমেই ভগবানকে দেখা যাবে। কারণ আমাদের অন্তরে কলুষতার মেঘ জমে রয়েছে। সেই কালিমা পরিমার্জিত না হলে আমাদের ভগবানের উপলব্ধি হবে না।

এই জন্যই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপকীর্তনের এই পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেছেন, চেতোদর্পনমার্জনম্-"চিত্তদর্পণটিকে পরিমার্জন করতে হবে।" ধুলিধূসরিত দর্পণটিকে পরিষ্কার না করলে যেমন নিজের মুখ ভালভাবে দেখা যায় না, তেমনি খুব ভালভাবে চিত্ত পরিমার্জন না করলেও পাপকর্ম ফলে পরিপূর্ণ অন্তরে ভগবানের যথাযথ উপলব্ধি অসম্ভব। কোন মতেই তা সম্ভব হয় না। গীতায় বলা হয়েছে-

যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুন্যকর্মণাম্।
তেদ্বন্দমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥

(গীতা ৭/২৮)

যে সমস্ত পুন্যবান ব্যক্তির পাপচিন্তা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয়েছে, তাঁরা ভগবানকে দেখতে পারেন। সেটা খুব সহজেই সম্ভব হয়। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্‌গীতায় বলেছেন-

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্য মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ ॥

(গীতা ১৮/৬৬)

এই জড় জগতে আমরা প্রত্যেকেই গতজন্মের এবং ইহজন্মের পাপকর্মের ফল ভোগ করছি। সেটা বাস্তব সত্য। কিন্তু পরম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন,"যদি তুমি আমার শরণাগত হও, আমার কাছে আত্মসমর্পণ কর, তাহলে তোমাকে সমস্ত পাপ থেকে আমি মুক্ত করব।"

অতএব পাপময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে হলে একটি মাত্র সহজ সরল পন্থা রয়েছে-পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে আত্মসমর্পণ। সেখানেই শুরু হয় ভগবদ্ভক্তি। যতোভক্তিরধোক্ষজে। ভগবানের পাদপদ্মে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেই ভক্তিজীবন শুরু হয়ে যায়। ভগবানে আত্মসমর্পণ করলে ভক্তিজীবন শুরু হয়ে যায়। ভগবানের কাছে আত্মসমর্পনই ভক্তিজীবন। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, খ্রিস্টান হোক, বৌদ্ধ হোক-তাতে কিছু আসে যায় না। অধোক্ষজ ভগবান তথা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা জাগাতে পারে যে কেউ। সেখানেই ভক্তির পরীক্ষা। আপনি বড়াই করে বলতে পারেন,"আমি ধার্মিক মানুষ," কিন্তু তার পরীক্ষা হয় আপনি ভগবানকে ভালবাসতে শিখেছেন কতটা, তাঁর শ্রীচরণে পরিপূর্ণভাবে নিজের সব কিছু সমর্পণ করতে পেরেছেন কতটা, সেই হিসাব দেখে।

পরকাল

ওঁ বিষ্ণুপদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

এই বিশ্বে স্থুল ও সুক্ষ্ম আকারবিশিষ্ট বস্তু-সমূহের দ্রষ্টা বা জ্ঞাতারূপে বিভিন্ন প্রাণী বিচরণ করে। প্রাণীগণের পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন আছে। এই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যাহা উপলব্ধ হয়, তাহাকেই ইহলোক বলে। জীবগণ ইন্দ্রিয়-সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করেন তাহা অক্ষজ জ্ঞান-মাত্র । ইন্দ্রিয়ের অবঘাতে, অভাবে ও বিকারে পরিদৃশ্যমান জগতের অনেকাংশ পরিলক্ষিত হয় না। আবার নানাপ্রকারে ইন্দ্রিয়-চালনাদ্বারা অনুমানাদির সাহায্যে দৃশ্যবস্তুর সম্বন্ধে অনেকটা অভিজ্ঞতা জন্মে। এই অক্ষজ জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি চারি প্রকার দোষে দুষ্ট হইবার যোগ্য। শাস্ত্রে এই দোষচতুষ্টয়কে ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা ও করুণাপাটব বলে। জগতের প্রাণীগণ এই চারিপ্রকার দোষে বিজড়িত হয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানাদি অক্ষ সাপেক্ষ ধারণায় দৃশ্য জগৎ ভোগ করেন। যাঁহারা ভোগপরায়ণ, তাঁহারাই ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে ঐতিহ্য বা লৌকিক জ্ঞানদৃপ্ত হয়ে নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণে সমর্থ হ'ন। যেখানে ব্যাঘাত ঘটে সেখানে ইন্দ্রিয়পরিচালনায় সঙ্কোচ দেখতে পাওয়া যায়। ইহলোক কর্ম্মের কর্ত্তা ইন্দ্রিয়তর্পনে অকৃতকার্য হয়ে দৃশ্য-জগতের প্রতি বিরাগ-ভাব পোষণ করেন। ভোগিগণের ইন্দ্রিয়তর্পনে ব্যাঘাত ঘটলেই তাঁহারা ব্রতপরায়ণ, কৃচ্ছ্রসাধন, কর্ম্মফলভোগ-বিরত সন্ন্যাস ও বাহ্যবস্ত্র-গ্রহণে বৈরাগ্য প্রদর্শন করেন। জগৎ দুঃখময়-কতিপয় কর্ম্মীর এই ধারণা কতকগুলি লোক ইন্দ্রিয়তর্পণের আদর্শকে সৎকর্ম্ম-প্রাপ্য জ্ঞান করেন। ইহলোকে ইন্দ্রিয়গুলি নশ্বর, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বিষয়গুলিও চিরস্থায়ী নহে। সুতরাং ইহলোকে বিচরণকালে প্রাণীগণ সুখার্থী হয়ে ইন্দ্রিয় পরিচালনা করেন, কিন্তু বিধির কঠিন নিয়তিবলে তাঁদের কপালে "সে গুড়ে বালিই" হয়ে যায়। বৈষ্ণব-কবি জ্ঞানদাস বলেন-"সুখের লাগিয়া এঘর বাঁধিনু, অনলে পুড়িয়ে গেল। অমিয় সায়রে, সিনান করিতে, সকলি গরল ভেল। শীতল বলিয়া ও-চাঁদ সেবিনু রবির কিরণ দেখি।"

ইহলোকে কর্ম্মবীরসমূহ নানাপ্রকার আকাশ-কুসুমের পশ্চাতে পশ্চাতে ধাবমান হয়ে কতই না তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকে, কিন্তু পরিশেষে বঞ্চিত হয়ে কর্ম্মফলভোগপ্রবৃত্তি হতে বিরত হ'ন। বিজ্ঞান, শিল্প, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও রসায়ন-শাস্ত্র, ধর্ম্মার্থকাম , প্রত্নতত্ত্ব, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিদ্যা, গৃহ্যসূত্র সমাজনীতি, শুক্রনীতি প্রভৃতি নানাবিধ "দিল্লীর লাড্ডু" আমাদিগকে ঐতিহ্য সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নাসিকাবিদ্ধ-বলদেব ন্যায় ধাবিত করায়। এই ভ্রমণ ভুমিই ইহলোক। আমরা এক মুহুর্ত্তের জন্য ও মনে করি না যে, এই সকল লইয়া আমরা কতদিন আর ইন্দ্রিয়তৃপ্তি করতে পারব। আমাদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির ব্যাঘাত ত'পদে পদে। স্ত্রীবিয়োগ, পুত্রবিয়োগ, শারীরিক অস্বাস্থ্য, মরণভীতি, অস্ত্রোপচারের ক্লেশ, বন্ধুবিচ্ছেদ, নৈরাশ্য, কপটের হস্তে

নিষ্পেষণ, সুখৈষণা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দাম ক্রিয়াকলাপ ও বৃত্তিসমূহ আমাদিগকে ইহলোক-বাসের দুরন্ত বাসনা হ্রাস করিয়ে দেয়। ইহলোকে এই আগমাপায়ীর অধিকার ও অনাধিকার-বিচার আমাদিগকে নানা ক্লেশ-জলধিতে তরঙ্গায়িত করে। 'কেনই বা আমি ইহলোকের অধিবাসী হইলাম-যে ইহলোকে নশ্বরতা ধর্ম্ম, অবচ্ছেদ-ধর্ম্ম, অপূর্ণধর্ম্ম আমাদিগকে খেলার পুতুল করে তুলছে, পদগোলকের (Foot Ball) ন্যায় এখানে সেখানে বিক্ষিপ্ত করছে- এক মুহুর্ত্তের জন্যও স্থির থাকতে দেয় না।' সুতরাং ইহলোকের আশাভরসা নিতান্তই রুদ্ধ। যে ইন্দ্রিয়গুলিকে আমরা ইহলোকেই ভোগায়তন মনে করি, সেগুলি আমাদের স্থায়ী সম্পত্তি নহে। আবার, স্থুলবস্তুজ্ঞানে যে সকল দ্রব্য আমাদের অধিকারে আসে, তাদেরও কর্পূরের ন্যায় উৎক্ষেপযোগ্যতা এবং গ্রহণকারী আমাদেরও অনিচ্ছাসত্ত্বে অসময়ে স্থানান্তরে প্রেরিত হবার যোগ্যতা থাকায় এই ভোগের বস্তুগলি এবং ভোগের যন্ত্রগুলির উপর আমরা আদৌ আস্থা স্থাপন করতে পারি না।

অনেকে বলেন, 'ইহলোকে অবস্থান কালে আমরা যতটুকু ইন্দ্রিয়তর্পণ করতে অধিকারী হই, ততটুকুই আমরা পেলাম। বিরাগবিশিষ্ট হলে উহা হতে বঞ্চিত হতে হয়। সেজন্য ইন্দ্রিয়-পরিচালনা ক্ষণিক জেনেও তদ্বারা সুখান্বেষণই আমাদের শ্রেয়ঃ।' এই আশা-ভরসায় আমাদিগের পুত্র-কন্যাদিগের ভাবী উন্নতির উদ্দেশ করে সুশিক্ষা প্রদান করি। যখন যাহা প্রয়োজন, সেরূপই করবার জন্য ব্যাগ্র হই, (১৭ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পুন্যনামের বন্যায় ভাসবে সবাই

২০ জানুয়ারী ১৯৯৬ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দির কক্ষে প্রদত্ত গীতা প্রবচন থেকে সংকলিত

-শ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ

একজন আসুরিক ব্যক্তি বলতে পারে-আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না, আমি ঈশ্বরের সামনে প্রণাম করব না। কারোর সামনে আমি কখনই প্রণাম করব না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যারা অসুর তাদের জন্য মৃত্যুরূপে ভগবান বিরাজ করেন। তারা যদি স্বেচ্ছায় ভগবানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম না করে, তা হলে মৃত্যুকালে চিৎ হয়ে ঠাকুরের সামনে শুয়ে পড়তে হবে, প্রণাম করতে হবে-তা ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই হোক।

আর দেহের মৃত্যুর পর আত্মা তো চিরকাল বেঁচে থাকে। পরের জন্ম কোন্ জায়গায় হবে তা বলার আমাদের অধিকার থাকে না। যেমন পাশ্চাত্য দেশে একটা ব্যবস্থা আছে যে, যারা ঘর থেকে বেরুতে চায় না, তাদের জন্য টেলিফোন গাইডের মতো একটা মোটা বইতে সমস্ত রকম জিনিসের নাম দাম বিবরণ দেওয়া আছে- জামাকাপড়, গাড়ি, খেলনা, বাড়ির কাজের জিনিস ইত্যাদি। তার থেকে পছন্দ করে ফোন করে দিলে বাড়িতে এসে দিয়ে যায়।

সেই রকম পরের জন্মে কি হব-দেবতা হব; না, অসুর হব-এই রকম একটা জনমত নেওয়া হয়েছিল ইউরোপিয়ান সব ছেলে-মেয়েদের কাছে-কে কি হতে চান। তাতে অনেকে বলেছে, আমি বাঘ হতে চাই, বিড়াল হতে চায় ইত্যাদি। ওদের কাছে এটা খেলার মতো।

তবে দৈব প্রভাবে সেই রকম কিছু ইচ্ছা থাকলে-হতে পারে। পশু হতে পারে, গাছ হতে পারে-তার ওপর কোনও বিচার নেই, বিচার ভগবানের হাতে।

তাই যদি কেউ স্পর্ধা দেখায়, আমি যা ইচ্ছা করব, সে তো চিরকাল বেঁচে থাকতে পারবে না এই দেহ মধ্যে, মৃত্যুর পর ভগবান বিচার করবেন।

তবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায়-

"পাপী তাপি যত ছিল
হরিনামে উদ্ধারিল
তার সাক্ষী জগাই মাধাইরে।"

শ্রীমায়াপুরে যখন বন্যা হয়েছিল, তখন চারিদিকে শুধু জল আর জল, নবদ্বীপ মায়াপুর সব ডুবে গিয়েছিল। সেই রকম, মহাপ্রভু বলছেন, সমস্ত জগত আমি ভগবৎ প্রেমে প্লাবিত করে দেব।

জগৎকে প্রেমে প্লাবিত করা-আমাদের একটা অনুমান রয়েছে, প্লাবনটা কি জিনিস। প্লাবন মানে, পালাবার কোনও উপায় নেই। দু'এক জনের দোতলা চারতলা বাড়ি থাকলে তারা পালিয়ে থাকতে পারে। তেমনই মহাপ্রভু দেখলেন তিনি যেখানে যেখানে গেছেন উড়িষ্যা, বিহার, বাংলা-সেই সব জায়গার সমস্ত লোক কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ারে প্লাবিত হলেও কয়েকজন নির্বিশেষবাদী তখনও পালিয়ে রয়েছে, তারা এখনও প্রেম বন্যায় ডুবে যায়নি।

তখন মহাপ্রভু বললেন, ঠিক আছে, ওরা পালাতে চায় পালাক

কিন্তু আমি একটা পরিকল্পনা নিচ্ছি ওদের উদ্ধার করবার জন্য। তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী যিনি মায়াবাদী আচার্য ছিলেন বেনারসে কাশীতে তাঁর কাছে গেলেন। সেখানে অনেক আচার্য সন্ন্যাসীরা এসেছেন। মহাপ্রভু দরজার কাছে যেখানে সব সন্ন্যাসীরা খালি পায়ে এসে পা ধুয়েছে-ঐ পা ধোয়া জলের মধ্যে উনি বসেছেন।

প্রকাশানন্দ বলছেন-আপনি ওখানে কেন? তখন মহাপ্রভু শরীর থেকে জ্যোতি প্রকাশ করছিলেন এবং মায়াবাদীরা জ্যোতিটা খুব ভালবাসে। তারা জ্যোতি দেখে তাঁর প্রভাব দেখে বলছে, আপনি এরকম নোংরা জায়গায় বসেছেন কেন?

মহাপ্রভু বলছেন, আপনারা তো সব উঁচু স্তরের সন্ন্যাসী, আপনাদের সাথে কি বসতে পারি? আমি এখানেই বসি। তখন প্রকাশানন্দ তাঁকে তাদের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

কেউ নিজে সেখানে বসতে চাইলে কি বসতে দিত? মহাপ্রভুর বিনয় ছিল একটা অস্ত্র। ঐ বিনয় দ্বারা তিনি একেবারে মাঝখানে পৌঁছেছিলেন। তখন ওরা সকলে মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করল, আপনি তো আমাদের মতো একজন সন্ন্যাসী, তবে আপনি জনসাধারণের সঙ্গে মিশে এরকম লীলা করেন কেন? কেন বেদান্ত পাঠ করেন না সন্ন্যাসীরা মতো?

মহাপ্রভু তখন কিছু বলার অনুমতি চেয়ে বললেন, আমি কি করব, আমার গুরুদেব আদেশ দিয়েছেন, কলিযুগে হরেকৃষ্ণ নামই একমাত্র উপায়-

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যতা ॥

(২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কৃষ্ণভাবনামৃতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

-শ্রীল ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী (পি,এইচ,ডি)

জড় বৈজ্ঞানিকদের সবচাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে যে তারা তাদের অনুসন্ধানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং মৌলিক তথ্যগুলি সম্বন্ধে সচেতন নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে নিউটন যখন গাছ থেকে আপেলটিকে পড়তে দেখলেন, তিনি তখন প্রশ্ন করলেন, কেন এবং কিভাবে সেই আপেলটি পড়ল। কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন না কার প্রভাবে সেই আপেলটি বৃন্তচ্যুত হয়ে মাটিতে পড়ল। এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম আবিষ্কার করেছিলেন। সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে আপেলটি মাটিতে পড়েছিল। কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিটি কে সৃষ্টি করেছেন? এই তথ্যটি বিশ্লেষণ ক'রে প্রভুপাদ বলেছেন যে আপেলটি যখন কাঁচা ছিল তখন সেটা পড়েনি, তা পাকবার পরেই পড়েছিল। সুতরাং নিউটনের আবিস্কৃত 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'র নিয়ম, আপেলটি বৃন্তচ্যুত হ'য়ে পড়ার পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। তার পিছনে অন্য আরেকটি কারণ রয়েছে এবং পরিণামে মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের পিছনেও সেই কারণটি কার্যকরী হচ্ছে। সেই কারণটি হচ্ছেন সর্বকারণের পরম কারণ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ভগবদ্গীতায়' বলা হয়েছে, 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' অর্থাৎ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছে সর্বকারণের পরম কারণ। সর্বোপরি বৈজ্ঞানিকদেরও জানা উচিত যে তাদের যে অতি নগণ্য সামর্থ্য তাও ভগবানের দান। কৃষ্ণ বলেছেন, 'পৌরুষং নৃসু' অর্থাৎ আমিই হচ্ছি মানুষের কর্মক্ষমতা।

দূরবীক্ষণ যন্ত্র ইত্যাদি বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে, অনুমানের মাধ্যমে জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে এবং আনুমানিক নকশার মাধ্যমে প্রচন্ড উদ্যমের সঙ্গে সৃষ্টি-তত্ত্ববিদ এব্য জ্যোতির্বিদরা জানবার চেষ্টা করছে। এই ব্রহ্মাণ্ড কি, এর আয়তন কত বড় এবং এর সৃষ্টির সময়ের মাপ কতটা। বর্তমানে তারা অনুমান করছে যে সৌরমন্ডলে হয়ত দশটি গ্রহ রয়েছে এবং সেই দশম গ্রহটিকে তারা খুঁজে বার করবার চেষ্টা করছে। যথার্থ উত্তর পেতে তারা যে কতটা সমর্থ হবে সেটা আমরা যথাসময়েই দেখতে পাব। তবে আসল কথা হচ্ছে যে, কোনদিনও তারা পরম বৈজ্ঞানিক শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্ট প্রকৃতির রহস্যগুলি পূর্ণরূপে অবগত হ'তে পারবে না। যে কোনও চিন্তাশীল মানুষই উপলব্ধি করতে পারবেন যে এই ব্রহ্মান্ডের আয়তন মাপতে যাওয়ার স্বপ্ন দেখাটাও কত বড় নির্বুদ্ধিতা, বিশেষ ক'রে যখন আমাদের সবচাইতে কাছের নক্ষত্র সূর্যের প্রকৃতি সম্বন্ধেও তাদের কোন জ্ঞান নেই। শ্রীল প্রভুপাদ সে সম্বন্ধে ব্যাঙ পন্ডিতের (উৎ. ঋৎড়ম-এর) উদাহরণ দিতেন। এই ব্যাঙ-পন্ডিতটি তিন ফুট আয়তনের একটা কুয়াতে বাস করে। বিশাল প্রশান্ত মহাসাগর সম্বন্ধে তার কোনই ধারণা নেই, কিন্তু প্রশান্ত মহাসাগরের কথা শুনে সে তার কুয়াটির আয়তনের পরিপ্রেক্ষিতে অনুমান করতে থাকে যে তার

আয়তন কি দু'টি কুয়ার মত, তিনটি কুয়ার মত, দশটি কুয়ার মত ইত্যাদি সে তার কুয়ার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন মাপার ভ্রান্ত প্রয়াস করে। অর্থাৎ আমাদের সীমিত ক্ষমতার অতীত যে অনন্ত জ্ঞান তাকে আমাদের সীমিত ক্ষমতা দিয়ে জানবার চেষ্টা করাটা কেবল সময় এবং শক্তির অপচয় মাত্র। প্রামাণিক শাস্ত্র বেদে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। পরম-তত্ত্ববিদ শ্রীকৃষ্ণের দেওয়া বেদ থেকে জ্ঞান আহরণ করাটাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পন্থা।

এই ব্রহ্মাণ্ড এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন সমস্ত জীবদের সৃষ্টির বিশদ বর্ণনা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্দের তৃতীয় অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে। জড়-জগৎ এবং চিৎ-জগতের বিশদ বর্ণনা ব্রহ্ম-সংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ে আছে, এবং ভগবদ্‌গীতা থেকে আমরা জানতে পারি যে এই জড়জগৎ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সৃষ্টিশক্তির এক-চতুর্থাংশের প্রকাশ। ভগবানের সৃষ্টিশক্তির অপর তিন-চতুর্থাংশ প্রকাশিত হয়েছে চিৎ-জগতে যাকে বলা হয় বৈকুণ্ঠলোক।

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুরূপে আবির্ভূত হ'য়ে তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ সনাতন গোস্বামীকে এই জড়জগতের তত্ত্ব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি তার বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে জড়জগতের সীমিত দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ আছে, কিন্তু বৈকুণ্ঠলোক অনন্ত-অসীম, তাকে কেউই মাপতে পারে না। এই বৈকুণ্ঠলোকগুলি হচ্ছে পদ্মফুলের পাপড়ির মত, এবং সেই পদ্মের কণিকার হচ্ছে কৃষ্ণলোক বা গোলকবৃন্দাবন।

(২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

অদ্ভুত মন্দির হইবে প্রকাশ

শ্রীধাম মায়াপুরে অত্যন্ত সুন্দর একটি মন্দির তৈরী হবে, সেখানে সারা পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ দর্শন করবে এবং ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপা লাভ করবে।

-শ্রীমৎ সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী

তখন মধ্যরাত্রি। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর নিচু ডেস্কের পিছনে একটি গদির উপরে বসে ছিলেন, তাঁর ঘরটি ছাড়া সারা বাড়িটি অন্ধকার। তাঁর ডেস্কের উপর একটি ডিকটেটিং মেসিন আর বাঙলা ভাষ্য সমন্বিত একটি শ্রীমদ্ভাগবত। দুটি গোলাপ আর অ্যাস্টার-এর ফলদানির মাঝখানে একটি ছোট ফ্রেমে তাঁর গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের একটি ছবি। তাঁর ডেস্কের অপর পারে ঘরের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে মেঝের উপর একটি তুলোর তোশক যেখানে কয়েক ঘন্টা পূর্বে ভক্তেরা এবং অতিথিরা বসে তার শ্রীমুখের বানী শ্রবণ করছিল। কিন্তু এখন তিনি একলা। সাধারণত তিনি দশটার সময় ঘুমোতে যান এবং তার তিন-চার ঘণ্টা পরে উঠে অনুবাদ করতে শুরু করেন। আজ রাত্রে তিনি বিশ্রাম করেননি এবং তার সামনে শ্রীমদ্ভাগবত বন্ধ অবস্থায় রয়েছে এবং ডিকটেটিং মেশিনটি ঢাকা দেওয়া রয়েছে। তিনি তাঁর দুজন শিষ্য তমালকৃষ্ণ এবং বলিমর্দনকে মায়াপুরে জমি কিনতে পাঠিয়েছিলেন। ছ'দিন হয়ে গেছে কিন্তু এখনও তাঁরা ফিরে আসেনি অথবা কোন খবর পাঠায়নি। তিনি তাঁদের বলেছিলেন লেনদেন পুরো না করে ফিরে না আসতে, কিন্তু ছটি দিন অতি দীর্ঘ সময়। সারাক্ষণ তাঁর দুটি শিষ্যের কথা চিন্তা করে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে ছিলেন। ঘরের খোলা জানালা দিয়ে নিমফুলের গন্ধ বহন করে মৃদুমন্দ বাতাস বইছিল। রাত্রি ক্রমে ক্রমে ঈষৎ ঠাণ্ডা হয়ে উঠছিল এবং প্রভুপাদ গায়ে একটি পাতলা চাদর জড়িয়ে রেখেছিলেন। সাদা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চিন্তামগ্ন প্রভুপাদের মন ছিল সেই পরিচিত ঘরের পরিবেশের অনেক দূরে। তাঁর আসনের পাশে একটি মাটির কুঁজোয় খাবার জল রাখা ছিল, আরেকটি ছোট টুলের উপর একটি ছোট টবে তুলসী রাখা ছিল। দিনে এবং রাত্রে অধিকাংশ সময়েই ইলেকট্রিসিটি থাকে না। তবে এখন রয়েছে, মথ এবং অন্যান্য কিছু পোকা ঘরের বাতিটির চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটি টিকটিকি ঘরের সিলিং-এ প্রহরীর মতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, মাঝে মাঝে দ্রুতবেগে বাতির কাছে ছুটে গিয়ে পোকা ধরছে। তমালকৃষ্ণ আর বলিমর্দন এত দেরি করছে কেন? এটি কেবল ছ'দিনের প্রতীক্ষা ছিল না; তিনি বেশ কয়েক বছর ধরে মায়াপুরে জমি কেনার চেষ্টা করছেন। এইবার সমস্ত সম্ভাবনাগুলি ছিল অপূর্ব। তিনি স্পষ্টভাবে তমালকৃষ্ণ এবং বলিমর্দনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কি করতে হবে, আজ তদের ফিরে আসা উচিত ছিল। হয়ত কোন রকম জটিলতা দেখা দিয়েছে, যেজন্য তাদের এত দেরি হচ্ছে অথবা তাদের কোন বিপদ ঘটে থাকতে পারে। যে জমিটি প্রভুপাদ কেনার চেষ্টা করেছিলেন সেটি ছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে ভক্তিসিদ্ধান্ত রোডের ওপর ন'বিঘা জমির একটি প্লট। শেখ নামক দুজন মুসলমান চাষী ছিল সেই জমির মালিক এবং তারা খুব চড়া দাম চাইছিল। নবদ্বীপ অঞ্চলের সাথে পরিচিত কলকাতার একজন উকিল ইদানিং তাদের সাথে কথাবার্তা বলে উপযুক্ত দাম বন্দোবস্ত করে এসেছেন। শেখ ভ্রাতাদ্বয় জমিটি বিক্রি করতে রাজী হয়েছে, এবং প্রভুপাদ কৃষ্ণনগরে তাঁর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার অনুমতি দিয়েছেন। তাই তমালকৃষ্ণ এবং বলিমর্দন সেখানে গিয়েছে, আর প্রভুপাদ কলকাতায় বসে তাঁর অন্যান্য কাজ সম্পাদন করার সাথে সাথে মায়াপুরে তাঁর শিষ্যদের কার্যকলাপের কথা চিন্তা করছেন। তাদের সেই কাজটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং তার চিন্তার মাধ্যমে তিনি তাদের প্রত্যক্ষ আশীর্বাদ করছিলেন।
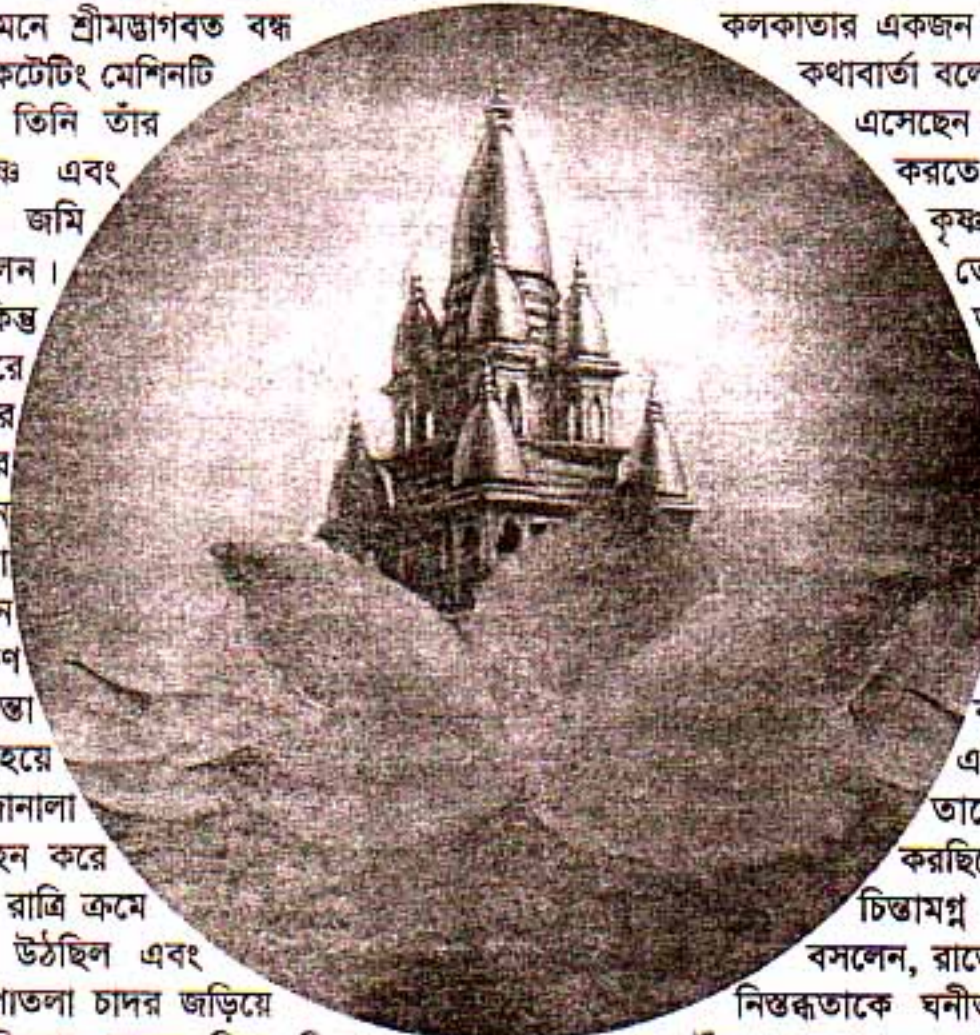
চিন্তামগ্ন হয়ে প্রভুপাদ সোজা হয়ে বসলেন, রাতের স্বাভাবিক শব্দগুলি রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ঘনীভূত করে তুলছিল। মাঝে মাঝে ইঁদুরদের চলার শব্দ, বারান্দায় নিদ্রারত ব্রহ্মচারীর নাক ডাকার শব্দ আর পাহারারত প্রহরীর লাঠি ঠোকার শব্দ। তখন রাস্তায় কোন গাড়ি নেই, মাঝে মাঝে কেবল রিক্সা চলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। প্রভুপাদ চিন্তা করছিলেন তাঁর ছেলেদের কাছ থেকে কেউ হয়ত টাকাগুলি চুরি করে নিয়েছে। তাদের পাঠাবার আগে তিনি তমাল কৃষ্ণকে দেখিয়েছেন কিভাবে কোমরে বেঁধে টাকা নিতে হয়। কিন্তু সেটা ছিল অনেক টাকা, এবং নবদ্বীপে প্রায়ই ডাকাতির সংবাদ পাওয়া যায়। হয়ত অন্য কোন কারণেও দেরি হয়ে থাকতে পারে। অনেক সময়ে জমি হস্তান্তরের সময়ে বহু টাকা লেনদেনে

কোর্টের কেরানি প্রতিটি নোটের নাম্বার টুকে নেয়। অথবা তাদের ট্রেন খারাপ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

হঠাৎ প্রভুপাদ সিঁড়িতে পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলেন। কেউ বাইরের দরজা খুলল এবং এখন বারান্দা দিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। "কে?" তমালকৃষ্ণ ঘরে ঢুকে শ্রীল প্রভুপাদের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করল।

"কি খবর?'

বিজয়ীর মতো তমালকৃষ্ণ ঘোষণা করল, "জমিটি এখন আপনার।" তাকিয়ে হেলান দিয়ে প্রভুপাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ঠিক আছে" তিনি বললেন, "এখন তুমি গিয়ে বিশ্রাম কর।"

প্রভুপাদ ইংল্যণ্ডে ভারতের হাইকমিশনারকে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন করতে তিনি যেন মায়াপুরে ইসকন-এর মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে প্রভুপাদ তাঁর সমস্ত জি,বি,সি সদস্যদের সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট নাগরিকদের নিমন্ত্রণ জানাতে। ভারতবর্ষে তাঁর শিষ্যদের তিনি লিখেছিলেন, তারা যদি ইন্দিরা গান্ধীকে না আনতে পারে তা হলে তারা যেন বাংলার রাজ্যপাল এস,এস ধাওয়ানকে অন্তত নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে আর্কিটেক্চার এবং ডিজাইন-এ অভিজ্ঞ তাঁর কয়েকজন শিষ্যের সাথে প্রভুপাদ লণ্ডনে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন মায়াপুর প্রকল্পের একটি পরিকল্পনার নকশা তৈরী করে। নরনারায়ণ রথ তৈরী করেছে এবং মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ ডিজাইন করেছে। রনছোর আর্কিটেক্চর নিয়ে পড়াশোনা করেছে, আর ভবানন্দ পূর্বে ছিল পেশাদারি ডিজাইনার, কিন্তু প্রভুপাদ নিজেই মায়াপুরের বাড়িগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর তিনজন শিষ্যকে নিয়ে গঠিত কমিটিকে বলেছিলেন স্কেচ এবং একটি ধৎপযরঃবপঃ সড়ফবষ তৈরী করতে। তিনি তখনই ভারতবর্ষে সেই প্রকল্পটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে এবং সাহায্য লাভের আয়োজন করতে শুরু করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। যে সমস্ত ভক্তরা প্রভুপাদের পরিকল্পনা শুনেছিল, তাদের কাছে মনে হয়েছিল এটি যেন ইকনের সব চাইতে উচ্চাভিলষিত প্রকল্প। রাসেল স্ট্রীট ধরে প্রাতভ্রমণ করার সময় প্রভুপাদ বিভিন্ন বাড়ি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন সেগুলি কত উচু। অবশেষে একদিন সকালবেলা তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মায়াপুরের মূল মন্দিরটি হবে তিন শ ফুটের বেশি উঁচু। তিনি বলেছিলেন যে বর্ষার সময় মায়াপুরের বন্যা এবং সেখানকার বেলে মাটি নানা রকম অদ্ভুত অসুবিধার সৃষ্টি করবে এবং তাই বাড়িটি এক বিশেষ ধরনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এক ধরনের ভাসমান ভেলার উপর। পরে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারও সেকথা বলেছিলেন।

মূল মন্দির, বিশাল মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির হবে তিন শ ফুটেরও অধিক উঁচু এবং তা তৈরি করতে হয়ত কয়েক কোটি টাকা লাগবে। প্রভুপাদের বর্ণনা architect (স্থপতি) এবং ভক্তদের উভয়কেই বিস্ময়ান্বিত করেছিল। শুনে মনে হয়েছিল তা যেন architectUnited States Capitol অথবা St. Peters Capthdral থেকেও বড় হবে। মন্দিরের মধ্যবর্তী গম্বুজে থাকবে ব্রহ্মাণ্ডের একটি প্রতিকৃতি। সেটি অবশ্য হবে বৈদিক বর্ণনাভিত্তিক এবং তা কেবল জড় জগতকেই দেখাবেনা, তাতে চিৎ জগতও দেখানো হবে। মূল কক্ষে প্রবেশ করে দর্শনার্থীরা দেখতে পাবে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে বিভিন্ন গ্রহের অবস্থিতি প্রথমে নিম্নতর পাতাললোক, তারপর মধ্যবর্তী লোকসকল যেখানে এই পৃথিবী অবস্থিত, তারপর উচ্চতর গ্রহলোক যেখানে দেবতারা বাস করেন, এবং সর্বোপরি ব্রহ্মলোক এই জড় জগতের সর্বোচ্চলোক। ব্রহ্মলোকের উর্ধ্বে দেবাদিদেব মহাদেবের ধাম এবং তার উপর চিদাকাশ বা ব্রহ্মজ্যোতি, চিন্ময় জ্যোতি অথবা ব্রহ্মজ্যোতিতে থাকবে জ্যোতির্ময় বৈকুণ্ঠলোক, যেখানে নিত্যমুক্ত জীবেরা বাস করেন এবং সর্বোপরি থাকবে কৃষ্ণলোক যেখানে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আদিরূপে তাঁর সব চাইতে অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে লীলা বিলাস করেন। মন্দিরে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাসাদও থাকবে যেখানে শোভা পাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ। সেই প্রাসাদটি সাজানো হবে সোনা, রূপা এবং নানা রকম মণিমাণিক্য দিয়ে। শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির এবং মায়াপুর নগরী হবে ইসকনের ডড়ৎষফ Head-quarters (বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র)। পৃথিবীর এক অজ্ঞাত স্থানে কেন এই অদ্ভুত বিস্ময়সূচক স্থাপত্য? সে সম্বন্ধে প্রভুপাদ বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে মায়াপুর অজ্ঞাত নয়; কেবল জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সে- রকম মনে হয়। জড় দৃষ্টির মাধ্যমে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে অজ্ঞাত বলে মনে হয়। আত্মা এবং জন্মান্তর অলীক বলে মনে হয়, আর জড় দেহ এবং জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে মনে হয় যেন মুখ্য। মায়াপুরে (মানব জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধির মন্দির) প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ জড় প্রভাবাচ্ছন্ন পৃথিবীর চেতনা বাস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন।

যে কোন ঐকান্তিক দর্শক ইসকনের মায়াপুর প্রকল্পের সৌন্দর্য দর্শন করে মোহিত হবেন এবং উপলব্ধি করবেন যে এটিই হচ্ছে চিৎ জগৎ। আর মায়াপুরে যে সমস্ত ভক্তরা থাকবে, তারা নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে মগ্ন থেকে এবং কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শন আলোচনা করে বুদ্ধিমান অতিথিদের বোঝাতে পারবে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। ভক্তরা পরম তত্ত্বদর্শন বিশ্লেষণ করবে, যার ফলে সেখানে সমাগত অতিথিরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমস্ত ধর্ম বিশ্বাসের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে প্রকৃত পারমাণবিক সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন। সর্বোপরি নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কির্তন এবং বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আনন্দময় ভক্তর দেখাবে যে ভক্তিযোগই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের সব চাইতে সহজ এবং সরল পন্থা। ইসকনের মায়াপুর নগরীতে এসে মানুষ অচিরেই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তে পরিণত হবে এবং দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়ে কীর্তন করবে এবং নৃত্য করবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শন করেছিলেন কিভাবে ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োগ করার ফলে জড় বস্তু চিন্ময়ত্ব লাভ করতে পারে। আর এই পারমর্থিক ঐশ্বর্য কেন জড়বাদীদের সমস্ত সাধিত বস্তুকে অতিক্রম করবে না?

ধার্মিক হতে চাইলেও দেহ তমোগুণাচ্ছন্ন হয়

১ ডিসেম্বর ১৯৯৬ শ্রীমায়াপুর-চন্দ্রোদয় মন্দিরে প্রদত্ত ভাগবত প্রবচন

-শ্রীমদ্ ভক্তিবিদ্যাপূর্ণ স্বামী মহারাজ

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের ষড়বিংশত (২৬) অধ্যায়ের প্রথম তিনটি শ্লোকে শ্রীনারদ মুনি জড় দেহ এবং তার মধ্যে বদ্ধ জীবের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন।

শ্রীনারদ মুনির প্রখ্যাত শিষ্য এবং ভগবানের মহান-ভক্ত ধ্রুব মহারাজের রাজবংশে মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎ যখন তাঁর রাজকার্য থেকে অবসর গ্রহণের কথা বিবেচনা করছিলেন, তখন তিনি তার পুত্রদের ও প্রজাদের মঙ্গল-সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের সকাম কর্মে গভীরভাবে যুক্ত হয়েছিলেন।

বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানের দ্বারা মানুষ উচ্চতর গ্রহলোকে বা স্বর্গলোকে উন্নীত হতে পারে, কিন্তু ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার মুক্তি তাতে লাভ করা যায় না। তাই, দেবর্ষি নারদ যখন দেখেছিলেন, ধ্রুব মহারাজের বংশধর এইভাবে সকাম কর্মের দ্বারা পথভ্রষ্ট হচ্ছেন, তখন তিনি তার প্রতি কৃপাপরায়ণ হয়েছিলেন এবং নিজে এসে জীবনের পরম লক্ষ্য ভক্তিযোগ সম্বন্ধে তাকে উপদেশ দেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীনারদ মুনি তখন মহারাজ প্রাচীনবর্হিষৎকে রাজা পুরঞ্জনের রূপক কাহিনীর মাধ্যমে উপদেশ দিয়েছিলেন। সেটি ছিল ভিন্নভাবে বর্ণিত রাজা বর্হিষতেরই ইতিহাস। (শ্রীল প্রভুপাদের ভাগবত তাৎপর্য, ৪/২৫/৯, পৃষ্ঠা ৩৭৫)

আলোচ্য শ্লোক তিনটি দিয়ে রাজা পুরঞ্জনের মৃগয়ায় গমন প্রসঙ্গ শুরু করা হয়েছে। শ্লোক তিনটিতে দেবর্ষি নারদ রাজা প্রাচীন বর্হিষৎকে বলেন, "হে রাজন্! এক সময় পুরঞ্জন তাঁর মহৎ ধনুক ও অক্ষয় তূণীর গ্রহণ করে এবং স্বর্ণনির্মিত বর্মে সজ্জিত হয়ে, একাদশ সেনাপতি সহ পাঁচটি দ্রুতগামী অশ্বচালিত রথে পঞ্চপ্রস্থ নামক বনে গমন করেছিলেন। সেই রথে তিনি দুটি বিস্ফোরক বাণ তাঁর সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই রথটির দুটি চক্র এবং ঘূর্ণায়মান অক্ষ ছিল। সেই রথে তিনটি পতাকা, একটি রজ্জু, একজন সারথি, একটি উপবেশন স্থান, জোয়াল লাগানোর দুটি দণ্ড, পাঁচটি অস্ত্র এবং সাতটি আবরণ ছিল। সেই রথের সমস্ত সাজসজ্জা এবং অলঙ্করণ স্বর্ণনির্মিত ছিল।

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এই তিনটি শ্লোকের বিশদ তাৎপর্য নির্ণয় করেছেন তাঁর অনবদ্য ভাগবত-ভাষ্যে। (ভাঃ ৪/২৬/১-৩, পৃষ্ঠা ৪৩৮-৪৪১) তিনি লিখেছেন, এই তিনটি শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, জীবের জড় দেহটি কিভাবে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দেহটি হচ্ছে রথ, এবং জীবাত্মা সেই রথের রথী। সেই কথা বিশ্লেষণ করে ভগবদ্গীতায় (২/১৩) বলা হয়েছে-দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে। দেহের যিনি মালিক, তাঁকে বলা হয় দেহী, এবং তিনি দেহের অভ্যন্তরে হৃদয়ে অবস্থিত। জীবের দেহরূপ সেই রথটি পরিচালিত হয় একজন সারথির দ্বারা। সেই রথটি তিনটি গুণের দ্বারা নির্মিত, যে-সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১৮/৬১) বলা হয়েছে- যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া। যন্ত্র শব্দটির অর্থ 'শকট'। এই যন্ত্র বা দেহটি জড়া প্রকৃতি প্রদান করেছে এবং সেই রথের সারথি হচ্ছেন পরমাত্মা। সেই রথের রথী হচ্ছে জীবাত্মা। এটিই হচ্ছে বাস্তবিক অবস্থা।

জীব সর্বদাই সত্ত্ব, রজ ও তম -এই ত্রিগুণের দ্বারা প্রভাবিত। সেই কথা ভগবদ্গীতায় (৭/১৩) প্রতিপন্ন হয়েছে। ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ-জীব জড়া প্রকৃতির তিনিটি গুণের দ্বারা বিমোহিত। এই তিনটি গুণকে এই শ্লোকে তিনটি পতাকা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পতাকার মাধ্যমে বোঝা যায়-রথের মালিক কে; তেমনই প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সহজেই বোঝা যায় কোন্‌দিকে সেই রথটি চলছে।

অর্থাৎ, যাঁর চোখ আছে, তিনি বুঝতে পারেন-প্রকৃতির কোন্ বিশেষ গুণের দ্বারা এই শরীর কোনদিকে চলছে। এই তিনটি শ্লোকে বোঝানো হয়েছে-মানুষ ধার্মিক হতে চাইলেও কিভাবে তার দেহ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়। নারদ মুনি মহারাজ প্রাচীনবর্হিষতের কাছে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, রাজা যদিও আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন, তবুও তিনি কিভাবে তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলেন।

কর্মকাণ্ড অনুসারে মানুষ বেদবিহিত বিভিন্ন যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে, এবং সেই সমস্ত যজ্ঞে পশুবলির নির্দেশ রয়েছে। যদিও যজ্ঞে পশুবলির উদ্দেশ্য বৈদিক মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা, তবুও পশুবলি অবশ্যই তামসিক আচার।

কেবল বৈদিক শাস্ত্রেই নয়, আধুনিক অন্য সমস্ত ধর্মশাস্ত্রেও পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ধর্মের নামে তাই সমস্ত পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তামসিক মানুষদের জন্যই এই পশুবলির নির্দেশ। এই সমস্ত মানুষেরা যখন পশুবলি দেয়, তখন তারা অন্তত ধর্মের নামে তা করে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের অতীত যে-ধর্ম, যেমন-বৈষ্ণবধর্ম, সেখানে পশুবলির কোনই অবকাশ নেই। এই প্রকার গুণাতীত ধর্মের কথা ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৬) শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন-

সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥

"সর্ব প্রকার ধর্ম পরিত্যাগ করে কেবল আমার শরণাগত হও। তা হলে আমি তোমাকে তোমার সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করব। ভয় করো না।"

যেহেতু মহারাজ প্রচীনবর্হিষৎ বিভিন্ন প্রকার যজ্ঞ অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত ছিলেন, যাতে পশুবধ হচ্ছিল; তাই নারদ মুনি তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এই প্রকার যজ্ঞ তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। শ্রীমদ্ভাগবতের (১/১/২) শুরুতেই বলা হয়েছে-

কোর্টের কেরানি প্রতিটি নোটের নাম্বার টুকে নেয়। অথবা তাদের ট্রেন খারাপ হয়ে গিয়ে থাকতে পারে।

হঠাৎ প্রভুপাদ সিঁড়িতে পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পেলেন। কেউ বাইরের দরজা খুলল এবং এখন বারান্দা দিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় মৃদু টোকা পড়ল। "কে?" তমালকৃষ্ণ ঘরে ঢুকে শ্রীল প্রভুপাদের সামনে দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করল।

"কি খবর?'

বিজয়ীর মতো তমালকৃষ্ণ ঘোষণা করল, "জমিটি এখন আপনার।" তাকিয়ে হেলান দিয়ে প্রভুপাদ দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। "ঠিক আছে" তিনি বললেন, "এখন তুমি গিয়ে বিশ্রাম কর।"

প্রভুপাদ ইংল্যণ্ডে ভারতের হাইকমিশনারকে বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন করতে তিনি যেন মায়াপুরে ইসকন-এর মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ইতিমধ্যে প্রভুপাদ তাঁর সমস্ত জি,বি,সি সদস্যদের সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি ভক্তদের নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতার সমস্ত বিশিষ্ট নাগরিকদের নিমন্ত্রণ জানাতে। ভারতবর্ষে তাঁর শিষ্যদের তিনি লিখেছিলেন, তারা যদি ইন্দিরা গান্ধীকে না আনতে পারে তা হলে তারা যেন বাংলার রাজ্যপাল এস,এস ধাওয়ানকে অন্তত নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে আর্কিটেক্চার এবং ডিজাইন-এ অভিজ্ঞ তাঁর কয়েকজন শিষ্যের সাথে প্রভুপাদ লণ্ডনে মিলিত হয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন তারা যেন মায়াপুর প্রকল্পের একটি পরিকল্পনার নকশা তৈরী করে। নরনারায়ণ রথ তৈরী করেছে এবং মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগ ডিজাইন করেছে। রনছোর আর্কিটেক্চর নিয়ে পড়াশোনা করেছে, আর ভবানন্দ পূর্বে ছিল পেশাদারি ডিজাইনার, কিন্তু প্রভুপাদ নিজেই মায়াপুরের বাড়িগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন। তারপর তিনি তাঁর তিনজন শিষ্যকে নিয়ে গঠিত কমিটিকে বলেছিলেন স্কেচ্ এবং একটি ধৎপযরঃবপঃ সড়ফবষ তৈরী করতে। তিনি তখনই ভারতবর্ষে সেই প্রকল্পটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে এবং সাহায্য লাভের আয়োজন করতে শুরু করবেন বলে ঠিক করেছিলেন। যে সমস্ত ভক্তরা প্রভুপাদের পরিকল্পনা শুনেছিল, তাদের কাছে মনে হয়েছিল এটি যেন ইস্কনের সব চাইতে উচ্চাভিলষিত প্রকল্প। রাসেল ষ্ট্রীট ধরে প্রাতভ্রমণ করার সময় প্রভুপাদ বিভিন্ন বাড়ি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করতেন সেগুলি কত উচু। অবশেষে একদিন সকালবেলা তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মায়াপুরের মূল মন্দিরটি হবে তিন শ ফুটের বেশি উঁচু। তিনি বলেছিলেন যে বর্ষার সময় মায়াপুরের বন্যা এবং সেখানকার বেলে মাটি নানা রকম অদ্ভুত অসুবিধার সৃষ্টি করবে এবং তাই বাড়িটি এক বিশেষ ধরনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এক ধরনের ভাসমান ভেলার উপর। পরে একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারও সেকথা বলেছিলেন।

মূল মন্দির, বিশাল মায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির হবে তিন শ ফুটেরও অধিক উঁচু এবং তা তৈরি করতে হয়ত কয়েক কোটি টাকা লাগবে। প্রভুপাদের বর্ণনা architect (স্থপতি) এবং ভক্তদের উভয়কেই বিস্ময়াম্বিত করেছিল। শুনে মনে হয়েছিল তা যেন architectUnited States Capitol অথবা St. Peters Capthdral থেকেও বড় হবে। মন্দিরের মধ্যবর্তী গম্বুজে থাকবে ব্রহ্মাণ্ডের একটি প্রতিকৃতি। সেটি অবশ্য হবে বৈদিক বর্ণনাভিত্তিক এবং তা কেবল জড় জগতকেই দেখাবেনা, তাতে চিৎ জগতও দেখানো হবে। মূল কক্ষে প্রবেশ করে দর্শনার্থীরা দেখতে পাবে শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনা অনুসারে বিভিন্ন গ্রহের অবস্থিতি প্রথমে নিম্নতর পাতাললোক, তারপর মধ্যবর্তী লোকসকল যেখানে এই পৃথিবী অবস্থিত, তারপর উচ্চতর গ্রহলোক যেখানে দেবতারা বাস করেন, এবং সর্বোপরি ব্রহ্মলোক এই জড় জগতের সর্বোচ্চলোক। ব্রহ্মলোকের উর্ধ্বে দেবাদিদেব মহাদেবের ধাম এবং তার উপর চিদাকাশ বা ব্রহ্মজ্যোতি, চিন্ময় জ্যোতি অথবা ব্রহ্মজ্যোতিতে থাকবে জ্যোতির্ময় বৈকুণ্ঠলোক, যেখানে নিত্যমুক্ত জীবেরা বাস করেন এবং সর্বোপরি থাকবে কৃষ্ণলোক যেখানে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর আদিরূপে তাঁর সব চাইতে অন্তরঙ্গ ভক্তদের সঙ্গে লীলা বিলাস করেন। মন্দিরে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রাসাদও থাকবে যেখানে শোভা পাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ। সেই প্রাসাদটি সাজানো হবে সোনা, রূপা এবং নানা রকম মণিমাণিক্য দিয়ে। শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির এবং মায়াপুর নগরী হবে ইসকনের ডড়ৎষফ Head-quarters (বিশ্বের প্রধান কেন্দ্র)। পৃথিবীর এক অজ্ঞাত স্থানে কেন এই অদ্ভুত বিস্ময়সূচক স্থাপত্য? সে সম্বন্ধে প্রভুপাদ বলেছিলেন প্রকৃতপক্ষে মায়াপুর অজ্ঞাত নয়; কেবল জড়জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে সে- রকম মনে হয়। জড় দৃষ্টির মাধ্যমে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে অজ্ঞাত বলে মনে হয়। আত্মা এবং জন্মান্তর অলীক বলে মনে হয়, আর জড় দেহ এবং জড় ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকে মনে হয় যেন মুখ্য। মায়াপুরে (মানব জীবনের উদ্দেশ্য উপলব্ধির মন্দির) প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদ জড় প্রভাবাচ্ছন্ন পৃথিবীর চেতনা বাস্ত সত্যের দিকে পরিচালিত করবেন।

যে কোন ঐকান্তিক দর্শক ইসকনের মায়াপুর প্রকল্পের সৌন্দর্য দর্শন করে মোহিত হবেন এবং উপলব্ধি করবেন যে এটিই হচ্ছে চিৎ জগৎ। আর মায়াপুরে যে সমস্ত ভক্তরা থাকবে, তারা নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কীর্তনে মগ্ন থেকে এবং কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শন আলোচনা করে বুদ্ধিমান অতিথিদের বোঝাতে পারবে যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাই সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। ভক্তরা পরম তত্ত্বদর্শন বিশ্লেষণ করবে, যার ফলে সেখানে সমাগত অতিথিরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমস্ত ধর্ম বিশ্বাসের সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে প্রকৃত পারমাণবিক সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবেন। সর্বোপরি নিরন্তর 'হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র' কির্তন এবং বিভিন্নভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে আনন্দময় ভক্তর দেখাবে যে ভক্তিযোগই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানের সব চাইতে সহজ এবং সরল পন্থা। ইসকনের মায়াপুর নগরীতে এসে মানুষ অচিরেই পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তে পরিণত হবে এবং দিব্য আনন্দে মগ্ন হয়ে কীর্তন করবে এবং নৃত্য করবে। শ্রীল প্রভুপাদ প্রত্যক্ষভাবে প্রদর্শন করেছিলেন কিভাবে ভক্তিযোগের মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় নিয়োগ করার ফলে জড় বস্তু চিন্ময়ত্ব লাভ করতে পারে। আর এই পারমর্থিক ঐশ্বর্য কেন জড়বাদীদের সমস্ত সাধিত বস্তুকে অতিক্রম করবে না?

প্রোজ্ঝিতকৈতবোহত্র। যে সমস্ত ধর্মে প্রতারণা রয়েছে, সেই সমস্ত ধর্মে শ্রীমদ্ভাগবত থেকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। যে-ধর্মে ভগবানের সঙ্গে জীবের সম্পর্কের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেই ভগবদ্ধর্মে পশুবলির নির্দেশ দেওয়া হয়নি। সংকীর্তন যজ্ঞ অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে- সমবেতভাবে এই মহামন্ত্র কীর্তনে পশুবলির কোনই নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

এই তিনটি শ্লোকে, মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রাজা পুরঞ্জনের বন গমন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ইন্দ্রিয় সুখভোগের প্রচেষ্টার প্রতীক। জড় দেহটি স্বয়ং ইঙ্গিত করে যে, জীব প্রকৃতির তিনটি গুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জাগতিক বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়েছে। দেহটি যখন তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন ভবরোগ অত্যন্ত প্রবল হয়। যখন তার রজগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখনও তার রোগটি বেশ কঠিন।

কিন্তু দেহ যখন সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়, তখন ভবরোগের উপশম হয়। শাস্ত্রে যে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্যই সত্ত্বগুণের স্তরে। কিন্তু যেহেতু এই জড় জগতে সত্তগুণ কখনও কখনও রজ ও তমোগুণের দ্বারা কলুষিত হয়, তাই সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মানুষেরাও কখনও কখনও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাজা পুরঞ্জন এক সময় বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন। তা জীবের তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকে ইঙ্গিত করছে। রাজা পুরঞ্জন যে বনে মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, তার নাম হচ্ছে পঞ্চপ্রস্থ। এই বনটি ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয়কে ইঙ্গিত করে। দেহে হস্ত, পদ, উদর, পায়ু ও উপস্থ-এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রয়েছে। তাই সমস্ত কর্মেন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে দেহ জড়জাগতিক জীবন উপভোগ করে। রথটি পাঁচটি অশ্বের দ্বারা চালিত, সেইগুলি হচ্ছে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা-চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি অতি সহজেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাই এখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, অশ্বগুলি অত্যন্ত দ্রুতগামী। রথে রাজা পুরঞ্জন দুটি বিস্ফোরক অস্ত্র রেখেছেন, সেইগুলি হচ্ছে অহঙ্কার অর্থাৎ 'আমি এই শরীর, এবং মমতা অর্থাৎ 'এই দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সব কিছুই আমার।'

রথের দু'টি চাকা হচ্ছে পাপ ও পুণ্য। তিনটি পতাকার দ্বারা রথটি সজ্জিত, যেগুলি প্রকৃতির তিনটি গুণের প্রতীক। পাঁচ প্রকার প্রতিবন্ধক হচ্ছে দেহাভ্যন্তরের পাঁচটি বায়ুর প্রতীক। সেইগুলি-প্রাণ, অপান, উদান, সমান ও ব্যান। দেহটি সপ্ত আবরণের দ্বারা আচ্ছাদিত। সেই সাতটি আবরণ-চর্ম, মাংস, মেদ, মজ্জা, রক্ত, অস্থি ও শুক্র। জীব তিনিটি সূক্ষ্ম জড় উপাদান এবং পাঁচটি স্থূল জড় উপাদানের দ্বারা আবৃত। এইগুলি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার পথে জীবের প্রতিবন্ধক।

এই শ্লোকে রশ্মি ('রজ্জু') শব্দটি মনকে ইঙ্গিত করে। নীড় শব্দটিতে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ নীড় শব্দটির অর্থ পাখির বাসা। এখানে নীড় বলতে বোঝানো হয়েছে হৃদয়, যেখানে জীবাত্মার অবস্থান। জীবাত্মা কেবল একস্থানে অবস্থান করে থাকে। তার সেই বন্ধনদশার দুটি কারণ- শোক ও মোহ। এই জড় জগতে জীব সর্বদা সেই বস্তুরই আকাঙ্খা করে, যা সে কখনই পেতে পারে না। তাই তাকে বলা হয়েছে মোহ। এই প্রকার মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় থাকার ফলে, জীব সর্বদা শোক করে। তাই, শোক ও মোহকে এখানে দ্বিকুবর বা বন্ধনের দুটি দণ্ড বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

জীব পাঁচটি বিভিন্ন উপায়ের দ্বারা তার বিবিধ বাসনা চরিতার্থ করে, যেগুলি তার পাঁচ কর্মেন্দ্রিয়রূপ উপায়। স্বর্ণ অলঙ্কার আর শয্যা জীবের রজোগুণের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রতীক। যার কাছে প্রচুর ধনসম্পদ রয়েছে, সে বিশেষভাবে রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়। রজোগুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানুষ এই জড় জগতে কত কিছু ভোগ বাসনা করে। এগারজন সেনাপতি দশটি ইন্দ্রিয় এবং মনের প্রতীক। মন সর্বদা দশজন সেনাপতির সঙ্গে পরিকল্পনা করে, কিভাবে জড় জগৎকে উপভোগ করা যায়। পঞ্চপ্রস্থ নামক যে বনে রাজা মৃগয়া করতে গিয়েছিলেন, সেটি হচ্ছে রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ ও স্পর্শ-ইন্দ্রিয়ের এই পাঁচটি বিষয়ের বন। এইভাবে ভাগবতের এই তিনটি শ্লোকে শ্রীনারদ মুনি জড় দেহ এবং তার মধ্যে জীবের বদ্ধ অবস্থার বর্ণনা করেছেন।

রাজা প্রাচীনবর্হিষৎ এক অতি সুযোগ্য বুদ্ধিমান পুরুষ ছিলেন, তাই শ্রীনারদ মুনি তাঁকে রাজা পুরঞ্জনের মৃগয়া গমনের এই রূপক কাহিনীর মাধ্যমে মানব দেহের রহস্য অতি নিপুণভাবে ব্যক্ত করেছিলেন। যাঁরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই অংশটি শ্রীল প্রভুপাদের সাবলীল তাৎপর্য সহ পাঠ করবেন, তাঁরা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন, মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি অনুযায়ী কিভাবে তার দেহের উপযোগ বা ব্যবহার হয়ে থাকে। ক্ষুধার তৃপ্তি না হলে, দেহ বিচলিত হয়। তাই দেহে তৃপ্তি-অতৃপ্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে হয়। যোগ সাধনায় সেই সামঞ্জস্য অতীব প্রয়োজন। যোগী মানুষ বেশি আহার করেন না, বেশি নিদ্রা উপভোগ করেন না। এইভাবে ইন্দ্রিয় সংযম না করলে পারমার্থিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করা সম্ভব নয়। যদি মন যা চায়, আমরা তাই করি, তাই খাই, তা হলে সেটা মানুষের জীবনের উপযুক্ত কাজ হয় না-সেটা পশুদেরই মানায়।

মানব-জীবনের আদর্শ হল সংযম, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। কিভাবে খাব, কখন খাব, কিভাবে চলবে, কিভাবে কথা বলব- সব কিছুই যথার্থ সভ্য মানব-সমাজে সুনিয়ন্ত্রিত এবং সংযতভাবে হয়ে থাকে। সেই কারণেই মানুষ হয় সভ্য, আর পশু থাকে অসভ্য হয়ে। সমাজে যখন মানুষ পশুর মতোই অসংযত অনিয়ন্ত্রিতভাবে খায়, পরে, চলে, বলে- তখন আর সমাজটিকে যথার্থ মানব-সমাজ বলা চলে না।

(২৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

যৌনসঙ্গই এই জড় জগতে বন্ধনের কারণ

-শ্রীপাদ মুরারিগুপ্ত দাস ব্রহ্মচারী

আমরা বহু জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই জড় জগতে চৌরাশি লক্ষ যোনির মাধ্যমে ভ্রমণ করছি। এই চৌরাশি লক্ষ যোনি সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ আছে-

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরা লক্ষবিংশতি।
কৃময়ো রুদ্রসংখ্যকাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষণম্।
ত্রিংশল্লক্ষাণি পশবঃ চতুর্লক্ষাণি মানুষাঃ॥

" নয় লক্ষ জলজ, বিশ লক্ষ বৃক্ষ-লতা আদি স্থাবর, এগারো লক্ষ কৃমি, কীট, সরীসৃপ প্রভৃতি, দশ লক্ষ পক্ষী, ত্রিশ লক্ষ পশু আর চার লক্ষ মনুষ্য-মোট চৌরাশি লক্ষ যোনি রয়েছে।"

চৌরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করার পর অর্থাৎ নিম্নযোনি থেকে ক্রমান্বয়ে উন্নত যোনি লাভ করে, অবশেষে মনুষ্যযোনি লাভ হয়। অর্থাৎ, আমরা ইতিপূর্বে সমস্ত যোনিভুক্ত জীবের সব রকম অভিজ্ঞতাই লাভ করেছি। এমন নয় যে আমরা হঠাৎ মনুষ্যদেহ লাভ করেছি।

চৌরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে আশি লক্ষ যোনিভুক্ত জীবের একমাত্র ধর্ম হচ্ছে-আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন। এই নিম্ন যোনিভুক্ত জীবেরা তমোগুণের দ্বারা এতই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে, তারা আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না।

পশুরা রক্ত, মাংস, কফ, পিত্ত, বায়ু সমন্বিত তাদের জড় শরীরটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে। এভাবেই দেহাত্মবুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা জড় দেহের তৃপ্তিবিধান ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না। যেহেতু জড় শরীরটিকে তাদের স্বরূপ বলে মনে করে, তাই তারা দেহজাত সন্তানাদিকে তাদের নিজের বলে মনে করে।

আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন-মানব-জীবনের উদ্দেশ্য নয়, এগুলি পশুজীবনে লাভ হয়। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার ঋষভদেব তাঁর একশো পুত্রদের উদ্দেশ্যে বলেছেন-

নায়ং দেহো দেহভাজাং নৃলোকে
কষ্টান্ কামানর্হতে বিড়্ভুজাং যে।
তপো দিব্যং পুত্রকা যেন সত্ত্বং
শুদ্ধ্যেদ্‌যস্মাদ্ ব্রহ্মসৌখ্যং ত্বনন্তম্॥

"হে পুত্রগণ এই জগতে দেহধারী প্রাণীদের মধ্যে এই নরদেহ লাভ করে, কেবল ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য দিন-রাত কঠোর পরিশ্রম করা উচিত নয়। ঐ প্রকার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ বিষ্ঠাভোজী কুকুর ও শুকরদেরও লাভ হয়ে থাকে। ভগবদ্ভক্তির অপ্রাকৃত স্তর লাভের জন্য তপস্যা ও কৃচ্ছসাধন করা উচিত। কারণ, তার ফলে হৃদয় নির্মল হয় এবং হৃদয় নির্মল হলে জড় সুখের অতীত অনন্ত চিন্ময় আনন্দ লাভ হয়।" (ভাগবত ৫/৫/১)

জড় সুখের অতীত অনন্ত চিন্ময় আনন্দ লাভ করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য-যা পশুজীবনে লাভ করা যায় না। প্রেমভক্তির সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা করার মাধ্যমেই আমরা সেই চিন্ময় আনন্দ আস্বাদন করতে পারি। সেই জন্য আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে রাখা উচিত। স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনই এই জড় জগতের আসক্তির কারণ। সেই সম্বন্ধে ভগবান ঋষভদেব বলেছেন-

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থিমাহুঃ।
অতো গৃহক্ষেত্রসুতাপ্তবিত্তৈ-
র্জনস্য মোহোহয়মহং মমেতি॥

"স্ত্রী ও পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জড়-জাগতিক জীবনের ভিত্তি। এই ভ্রান্ত আসক্তিই হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ পরস্পরের হৃদয়গ্রন্থি-স্বরূপ এবং তার ফলেই জীবের দেহ, গৃহ, সম্পত্তি, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও ধন-সম্পদ আদিতে 'আমি ও আমার' বুদ্ধিরূপ মোহ উৎপন্ন হয়।" (ভাগবত ৫/৫/৮)

স্ত্রী-পুরুষের মৈথুনই এই জড়-জগতের বন্ধনের একমাত্র কারণ। মানুষ অজ্ঞানতা-বশত এই মৈথুন-সুখকে জীবনের উদ্দেশ্যে বলে মনে করে। চিন্ময় আনন্দের তুলনায় এই মৈথুনসুখ অত্যন্ত তুচ্ছ। সেই সম্বন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছেন-

যন্মৈথুনাদি গৃহমেধিসুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডুয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।
তৃপ্যন্তি নেহ কৃপণা বহুদুঃখভাজঃ।
কণ্ডূতিবন্মনসিজং বিষহেত ধীরঃ॥

"চুলকানির উপশমের জন্য দুই হাতের ঘর্ষণের সঙ্গে মৈথুনের তুলনা করা হয়। গৃহমেধী বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানরহিত তথাকথিত গৃহস্থেরা মনে করে যে, এই চুলকানিটিই সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে সমস্ত দুঃখের উৎস। কৃপণ অথবা মূর্খেরা, যারা ব্রাহ্মণের ঠিক বিপরীত, তারা বারবার ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের ফলেও কখনও তৃপ্ত হয় না। কিন্তু যাঁরা ধীর, তাঁরা এই চুলকানি সহ্য করেন এবং তার ফলে তাঁদের মূঢ়দের মতো দুঃখভোগ করতে হয় না। (ভাগবত ৭/৯/৪৫)

জড় দেহটিকে নিজের স্বরূপ বলে মনে করার ফলে মানুষ মৈথুন-সুখের প্রতি আসক্ত হয়-ঠিক যেমন পশুরা আসক্ত হয়ে পড়ে। মানুষ ইন্দ্রিয়-সুখের প্রতি আসক্ত হয়ে বিকর্মপরায়ণ হয়। তাই ঋষভদেব সাবধান করে দিয়ে বলেছেন-

নূনং প্রমত্তঃ কুরুতে বিকর্ম
যদিন্দ্রিয়প্রীতয় আপৃণোতি।
ন সাধু মন্যে যত আত্মনোহয়-
মসন্নপি ক্লেশদ আস দেহঃ॥

"জীব যখন ইন্দ্রিয়সুখ ভোগকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে

বিবেচনা করে, তখন সে অবশ্যই জড়-জাগতিক জীবনের প্রতি উন্মত্তের মতো আসক্ত হয়ে নানা প্রকার পাপকর্মে প্রবৃত্ত হয়। সে জানে না যে, তার পূর্বকৃত পাপকর্মের ফলে সে একটি শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, যা অনিত্য এবং সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার কারণ। প্রকৃতপক্ষে জীবের জড় দেহ ধারণ করার কথা নয়, কিন্তু ইন্দ্রিয়-সুখের আকাঙ্ক্ষা করার ফলে, সে জড় দেহ ধারণ করে। তাই আমি মনে করি যে বুদ্ধিমান মানুষের পক্ষে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়, যার ফলে সে একটির পর একটি জড় শরীর প্রাপ্ত হয়।

(ভাগবত ৫/৫/৪)

তপস্যা ছাড়া কোন মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয় না। তাই প্রথম তপস্য হচ্ছে উপস্থ-বেগকে দমন করা অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়া। যাঁরা ষড়বেগকে দমন করতে পারেন, তাঁরা সমগ্র পৃথিবীকে জয় করতে পারেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীল রূপ গোস্বামী বলেছেন-

বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্বামপীমাং পৃথিবীং শিষ্যাৎ ॥

"যে সংযমী ব্যক্তি বাক্যের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, মনের বেগ, উদর ও উপস্থের বেগ-এই ষড় বেগ দমন করতে সমর্থ, তিনি পৃথিবী শাসন করতে পারেন।"

(উপদেশামৃত শ্লোক ১)

জিহ্বা, বাক্য, উদর ও উপস্থ-এক সরল রেখায় অবস্থিত। তাই, এই বেগগুলিকে দমন করতে হলে আহার শুদ্ধির একান্ত প্রয়োজন। সেই সম্বন্ধে বেদে বলা হয়েছে-

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ।
ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ ॥

"যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে আহার্য-দ্রব্যসমূহ শুদ্ধ হয় এবং তা আহার করার ফলে জীবের সত্তা শুদ্ধ হয়। সত্তা শুদ্ধ হবার ফলে স্মৃতি শুদ্ধ হয় এবং তখন সে মোক্ষ লাভের পথ খুঁজে পায়।"

যাঁরা যৌনসঙ্গকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করতে অক্ষম, তারা গৃহস্থ-আশ্রম গ্রহণ করতে পারে। গৃহস্থ-আশ্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত যৌনসঙ্গের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্ত সন্তান জন্মদান করা। শাস্ত্রে এই প্রকার নিয়ন্ত্রিত বৈবাহিক জীবনের অনুমোদন রয়েছে।

অনিয়ন্ত্রিত বৈবাহিক জীবন শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়নি। যথেচ্ছাচার ইন্দ্রিয়-তর্পন বৈবাহিক জীবনের উদ্দেশ্য নয়। ক্রমশ যৌনসঙ্গকে নিয়ন্ত্রিত করে সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীসঙ্গ থেকে মুক্ত হওয়াই বৈবাহিক জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। সেটিই বানপ্রস্থ-জীবন যাতে সম্পূর্ণভাবে ভগবানের চিন্তায় নিজেকে নিমগ্ন করা যায়।

যতক্ষণ পর্যন্ত যৌনসুখের বাসনা থাকে, ততক্ষণ ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না। যৌনসঙ্গই এই জড় জগতের বন্ধনের কারন। এর থেকে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে সর্বক্ষণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় সর্বতোভাবে নিয়োজিত করে রাখা, ঠিক যেভাবে অম্বরীষ মহারাজ তাঁর সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে ভগবানের সেবা করেছিলেন। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে-

স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে ॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ
তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণং চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে ॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশ-পদাভিবন্দনে।
কামং চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ ॥

"মহারাজ অম্বরীষ সর্বদা তাঁর মনকে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের ধ্যানে, তাঁর বাণী ভগবানের মহিমা বর্ণনায়, তাঁর হস্তদ্বয় মন্দির মার্জনে, তাঁর কর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শ্রবণে, তাঁর চক্ষুদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ এবং মথুরা-বৃন্দাবন আদি স্থানে শ্রীকৃষ্ণের মন্দির দর্শনে, তাঁর স্পর্শেন্দ্রিয় ভগবদ্ভক্তের অঙ্গ স্পর্শনে, তাঁর ঘ্রাণেন্দ্রিয় ভগবানের পাদপদ্মে নিবেদিত তুলসীর ঘ্রাণ গ্রহণে, তাঁর রসনা কৃষ্ণপ্রসাদ আস্বাদনে, তাঁর চরণদ্বয় তীর্থস্থান ও ভগবানের মন্দিরে গমনে, তাঁর মস্তক ভগবানকে প্রণতি নিবেদনে এবং তাঁর কামনাকে সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা সম্পাদনে নিযুক্ত করেছিলেন,

"প্রকৃতপক্ষে মহারাজ অম্বরীষ তাঁর নিজের ইন্দ্রিয়সুখ ভোগের জন্য কোন কিছু কামনা করেননি। তিনি তাঁর সব কয়টি ইন্দ্রিয় ভগবানের বিভিন্ন সেবায় নিযুক্ত করেছিলেন। ভগবানের প্রতি আসক্তি লাভ করে সমস্ত জড় বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হবার এটিই পন্থা।" (ভাগবত ১৮/৯/১৮-২০)

মহারাজ অম্বরীষ ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। তিনি ছিলেন আদর্শ রাজা। তিনি প্রজাদের শিক্ষা দিয়েছিলেন- কিভাবে ভক্তিযোগ অনুশীলন করে ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। জড় জগতে বদ্ধ জীবদের কর্তব্য অম্বরীষ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ভক্তিযোগে সর্বতোভাবে নিয়োজিত থাকা।

ইস্কন বা আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ হচ্ছে সমগ্র বিশ্বের মধ্যে সর্ববৃহৎ ভক্তিযোগের শিক্ষাকেন্দ্র। জগদ্গুরু কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সমগ্র বিশ্ববাসী অক্লান্ত প্রচারের ফলে এই সুবৃহৎ আন্তর্জাতিক ভক্তিযোগের কেন্দ্রটি দিকে দিকে প্রসারিত হয়েছে।

প্রতিটি বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য ভক্তিযোগে অংশ গ্রহণ করে মানব-জীবনকে সফল করা। ভক্তিযোগ শুরু হয় হরে কৃষ্ণ

'মহামন্ত্র' কীর্তনের মাধ্যমে-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

হরে কৃষ্ণ 'মহামন্ত্রের' সুফল পেতে হলে চারটি পাপকর্ম অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে। এই চারটি পাপকর্ম হচ্ছে-নেশা করা, আমিষ আহার, জুয়া খেলা ও অবৈধ যৌনসঙ্গ।

এই হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র হচ্ছে যুগধর্ম, যা ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রবর্তন করে গেছেন। হরে কৃষ্ণ 'মহামন্ত্র' জপকীর্তন ছাড়া এই কলিযুগে ভগবানকে উপলব্ধি করার আর কোন দ্বিতীয় পন্থা নেই। সেই সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয় পুরাণে বলা হয়েছে-

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে হরিনাম ছাড়া অন্য কোন গতি নেই, অন্য কোন গতি নেই, অন্য কোন গতি নেই।"এই হরিনামই হচ্ছে সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব। অর্থাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায় হচ্ছে হরিনাম, তাই হরিনাম হচ্ছে সাধনতত্ত্ব। আবার, হরিনামের দ্বারাই হরিনামকে উপলব্ধি করা যায়। অর্থাৎ, ভগবান শ্রীহরি ও হরিনাম যে একই বস্তু তা উপলব্ধি করা যায়, তাই হরিনাম হচ্ছে সাধ্যতত্ত্ব।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্ত সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করে কেউ যখন প্রেমভক্তি সহকারে হরে কৃষ্ণ 'মহামন্ত্র' জপ-কীর্তন করে এবং শ্রীগুরুর মুখনিঃসৃত কৃষ্ণকথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করে, তখন সে ক্রমশ জড় কলুষমুক্ত হয়ে অচিরেই চিন্ময় স্বরূপে অধিষ্ঠিত হয়। তখন সে কামরূপ হৃদরোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়। সেই সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে (১০/৩৩/৩৯) বলা হয়েছে-

বিক্রীড়িতং ব্রজবধুভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোহনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

"যিনি অপ্রাকৃত শ্রদ্ধান্বিত হয়ে এই রাস-পঞ্চাধ্যায়ে ব্রজবধুদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত ক্রীড়াবিলাস শ্রবণ করেন বা বর্ণনা করেন, সেই ধীর পুরুষ ভগবানে যথেষ্ট পরা ভক্তি লাভ করে হৃদ্‌রোগরূপ জড় কামকে শীঘ্রই দূর করেন।"

জড়-জাগতিক কামবাসনা, বিশেষ করে যৌনসুখ বাসনা থেকে কে কতখানি মুক্ত হয়েছে, তার দ্বারা প্রমাণিত হয় কতদূর সে পারমার্থিক স্তরে ভগবৎ-অনুভূতিতে এগিয়ে রয়েছে। বৈষ্ণবের সংজ্ঞায় শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর তাঁর 'বৈষ্ণব কে'কবিতায় উলেখ করেছেন-

'কনক-কামিনী', 'প্রতিষ্ঠা-বাঘিনী'
ছাড়িয়াছে যারে, সেই ত' বৈষ্ণব।

কেউ যখন সর্বক্ষণ কোন না কোনভাবে কৃষ্ণসেবায় রত থাকেন, তিনি অনায়াসে সমস্ত জড় বাসনা থেকে মুক্ত হন, এমন কি কোন রকম যৌন বাসনা তাঁর মধ্যে থাকে না। এটিই ভগবদ্ভক্তির মহিমা। উৎকৃষ্ট রস আস্বাদন করার ফলে যেমন নিকৃষ্ট রসের প্রতি রুচি থাকে না, তেমনই ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদন করার ফলে তাঁর আর কোন কিছু পাওয়া বাকি থাকে না।

ধ্রুব মহারাজ তাঁর পিতামহের থেকেও সুবিশাল রাজ্য লাভের আশায় যমুনা নদীর তীরে মধুবনে কঠোরভাবে তপস্যা করেছিলেন এবং ছয় মাসের মধ্যে তিনি ভগবান শ্রীহরির সাক্ষাৎ লাভ করেন। শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম শোভিত ভগবানের দিব্য প্রফুল্ল বদন দর্শন করে ধ্রুব মহারাজ সমস্ত জড় কলুষ থেকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত প্রেমসিন্ধুতে অবগাহন করেন।

ধ্রুব মহারাজ যেহেতু কামনা সহকারে তপস্যা করেছিলেন, তাই ভগবান তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, "তুমি ছত্রিশ হাজার বছর ধরে সসাগরা পৃথিবী শাসন করবে। আর যেহেতু তুমি তোমার পিতামহ থেকেও সুবিশাল রাজ্য কামনা করেছিলে, তাই তুমি বৈকুণ্ঠলোক-সদৃশ ধ্রুবলোকে উত্তীর্ণ হবে এবং সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র তোমাকে প্রদক্ষিণ করবে। ব্রহ্মার মৃত্যুতে যখন এই ব্রহ্মাণ্ড সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, তখন তুমি বৈকুণ্ঠলোকে আমার কাছে ফিরে আসবে।"

ভগবান শ্রীহরির এই নির্দেশ লাভ করে ধ্রুব মহারাজ শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। তিনি শোকাতুর হয়ে বলেছিলেন, "হায়, আমি কি করলাম! হৃদয়ে জড় কামনা-বাসনা থাকায়, ভগবানকে সম্মুখে পেয়েও আমি মুক্ত জগতে ফিরে যেতে পারলাম না। আমার জীবন দিক।" ধ্রুব মহারাজকে শ্রীহরি বর দিতে চাইলে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন-

স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোহ হং
ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্ ॥
কাচং বিচিন্বন্নপি দিবরত্নং
স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে।

হে প্রভু! আমি এই জড় জগতে উচ্চপদ লাভ করার বাসনায় তোমার তপস্যায় রত হয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেবতা এবং মুনীন্দ্রেরও দুর্লভ তোমাকে প্রাপ্ত হয়ে আমি কৃতার্থ হয়েছি। সামান্য কাঁচ অন্বেষণ করতে করতে আমি দিব্যরত্ন পেয়েছি। আমি আর অন্য বর কামনা করি না।"

ধ্রুব মহারাজ ছিলেন রাজপুত্র। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে তিনি ভগবানকে লাভ করেছিলেন। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে-কেউ ভগবানের আরাধনার মাধ্যমে ভগবানকে লাভ করতে পারে। সেটিই মানব-জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর তা না হলে জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধির মাধ্যমে চৌরাশি লক্ষ যোনিতে বারংবার ভ্রমণ করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় থাকবে না। সমস্ত রকমের কামকে জয় করার জন্য এই কলিযুগে একমাত্র 'মহামন্ত্র' হচ্ছে-

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সাম্য অবস্থা ক্ষোভিত হওয়ার ফলে মহতত্ত্ব সৃষ্টি করে। ক্ষোভিত শব্দের অর্থ বিস্ফোরণ। দেখা যাচ্ছে বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে মহতত্ত্বের সৃষ্টি হয়, যাহা ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। বিস্ফোরণের পর তাপমাত্রা ছিল ১০০০ জলন্ত সূর্যের সমান।

তস্যনাভেরভূৎপদ্মংসহস্রার্কোরুদীধিতি।

সর্বজীবনিকায়ৌকো যত্র স্বয়মভূৎস্বরাট্ (ভাগবত ৩/২০/১৬)

অনুবাদ ঃ

গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে একটি সহস্র সূর্যের মত উজ্জল পদ্ম উদ্ভূত হয়েছিল। সেই পদ্মটি সমস্ত বদ্ধ জীবের অধিষ্ঠানস্বরূপ এবং প্রথম জীব সর্ব শক্তিমান ব্রহ্মা সেই পদ্মটি থেকে আবির্ভূত হয়েছিল। বিস্ফোরণের পর যে পদ্মটি সৃষ্টি হয়েছিল তাহার তাপমাত্রা ১০০০ (এক হাজার) জলন্ত সূর্যের তাপের সমান ছিল। বিজ্ঞানী স্টীফেন হকিং কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বইটির মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি অধ্যায়ে (১০০ পাতা) আলোচনা করেছেন, মনে করা হয় বিস্ফোরণের সময় মহাবিশ্বের আয়তন ছিল শূন্য সুতরাং উত্তাপ ছিল অসীম। মহাবিশ্ব সম্প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা নেমে এসেছিল প্রায় এক হাজার কোটি ডিগ্রীতে। এ তাপ সূর্যের কেন্দ্রের তাপের চাইতে প্রায় এক হাজার গুণ বেশী। ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে বিস্ফোরণের পর তাপমাত্রার পরিমাণ ১০০০ (এক হাজার) জলন্ত সূর্যের তাপের সমান, আর বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে বিস্ফোরণের পর তাপমাত্রা ১০০০ (এক হাজার) সূর্যের কেন্দ্রের তাপের সমান। বিষয় দুইটি অত্যন্ত অদ্ভূদভাবে মিলে গিয়াছে। এই সকল আলোচনা থেকে উপলব্ধি করা যায় কারণ সমুদ্রে বুদ্‌বুদ্ তত্ত্বের মাধ্যমে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে আর প্রতিটি বুদ্‌বুদের মধ্যে গর্ভোদক সমুদ্রের মাঝে বিগব্যাঙ্গ তত্ত্বের মাধ্যমে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। ভাগবত ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ধারণ করেছেন, তাই ইহা বিজ্ঞানের আবিস্কৃত তত্ত্বগুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছে। ভাগবতের আলোকে ব্রহ্মাণ্ড এবং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি পদ্ধতি আলাদা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা ব্রহ্মাণ্ড আর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন নাই। তাদের মতে ব্রহ্মাণ্ড আর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আলাদা নয়, একই। তাই তাহারা তাদের তৈরী সূত্র গুলির মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারছেনা। যাহা বিজ্ঞানী হকিং বলেছেন। বিজ্ঞানীরা বুদ্‌বুদ্ তত্ত্ব ও বিগব্যাঙ্গ তত্ত্ব দুইটিকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি পদ্ধতি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। সেই জন্য সেগুলো পরস্পর বিরোধী হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা যদি সঠিক ও পুর্ণাঙ্গভাবে মহাবিশ্বের নিখুত বর্ণনা করতে চায়, তবে তাদের কে ভাগবত পড়তে হবে। কোরআন, বাইবেল, বেদ ও বিজ্ঞান নামে একটি বই প্রকাশিত হয়েছে, ধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা খুব সংক্ষেপে উক্ত বই থেকে প্রকাশ করলাম। যারা এই সকল বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান, তাদের এই বই পড়তে হবে।

'পরকাল' ০৬ পৃষ্ঠার পর

ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সময় ক্লেশ সমাগত হয়, তাহা তখন পরিহার করবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করি এবং ইহলোকে ইহাই কর্ত্তব্য বলে বুঝে রাখি। আমরা আরও বুঝি এই যে, ইহলোকের পরে এই ইন্দ্রিয়গুলির অভাবে এবং আমাদের প্রাণের অভাবে ভোগময় জগতের অস্তিত্ব আমরা এইরূপভাবে ধারণা করতে পারব না। লোকান্তরিত হলে আমাদের এই প্রকার ইন্দ্রিয়ের অভাবে, দৃশ্য জগতের পরিবর্তন ঘটবে। ইহলোকে থেকে কল্পনাদ্বারা পরলোকের দৃশ্য জগৎ ও আমাদের অধিষ্ঠান আমরা ধারণা করতে পারি না। ঐহিক বিচার অবলম্বন করে যদি আমরা পরলোকের বিচার কল্পনা করি, তবে তাহা বাস্তব সত্য না-ও হতে পারে। ইহলোকে যে কয়েকটি ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ আছে, তাহার কি পরিমাণ সমাবেশ আমরা পরলোকে পাব, ঐহিক চেষ্টাদ্বারা তাহা নিরূপণ করতে গেলে আমরা যে ভ্রমে পতিত হব না, তাহা কিরূপে জানা গেল? পরলোকের বিষয় ঐহিক ধারণায় প্রমত্ত ব্যক্তিগণের নিরন্তর ইন্দ্রিয়তর্পণে পর্য্যবসিত। কিন্তু তাহাও নশ্বর বলে বিচারশাস্ত্রে লিখিত আছে। গীতা-পাঠকালে "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্তলোকং বিশন্তি" অর্থাৎ ত্রিদশপুর-বাস স্থুল-ইন্দ্রিয় পরিহার করে সুক্ষেন্দ্রিয়দ্বারা সম্ভবপর হলেও নিত্য নহে, নশ্বর মাত্র-এই কথা বেশ উপলব্ধি হয়। পরলোকের স্বর্গাদি-সুখভোগ বা নরকাদি দুঃখভোগ নিত্য নহে। কিন্তু আত্মার ধর্ম্ম অপরিবর্তনীয় ও নিত্য, সুতরাং অনাত্মবৃত্তিতে অবস্থিতিকালে পরলোকের ধারণায় ইহলোকে কতকটা হেয়াংশ না থাকিলেও স্বর্গাদিতে নশ্বরাদিরূপ হেয়াংশ সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এই স্বর্গসুখের ভোক্তা ইহলোকের কর্ম্মী প্রভৃতি প্রাণীগণ, নরকাদির ভোক্তাও তাঁহারা। যে উপাদান অবলম্বন করে নশ্বর সুখদুঃখাদি-ভোগ হয়, তাহা উপাধি মাত্র। বস্তুর নিত্যশক্তির উহা পরিচয় নহে। কতকগুলি ব্যক্তি স্বর্গসুখাদির হেয়তা উপলব্ধি করে আপনাদিগকে নির্ব্বেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানে রত জানেন, তাহাও বদ্ধ ও মুক্ত অবস্থা ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায় সেই লোকে নিত্যত্বের ব্যাঘাত আছে। নির্ব্বেদব্রহ্ম কেনই বা ইহলোকে বিভিন্ন হয়ে জীব-উপাধিতে অনর্থক কষ্ট পাইবেন? আর যিনি তাদৃশ কষ্ট পান, তাঁহার বন্ধনমোচনই বা কেন নিত্যত্বের ব্যাঘাত করবে?-এই সকল কথার সুমীমাংসা ঐহিক যুক্তিদ্বারা নানাপ্রকারে বিপন্ন হয়। ইহলোকে প্রত্যক্ষ বা স্থুল-ইন্দ্রিয়জ্ঞান প্রবল স্বর্লোক, পরোক্ষ বা সুক্ষ্ম ভোগ প্রবল এবং তাহাও বালকদিগের অনুশাসন মাত্র। এরূপ জেনে অপরোক্ষ পরলোকবাদী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয় ইন্দ্রিয়ের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার সম্মেলন আকাঙ্খা করেন। তাঁদের তাদৃশ ঐহিক সম্মেলনাকাঙ্খা পরলোক সম্বন্ধীয় জ্ঞানপথের আদৌ নির্দ্দেশক না-ও হতে পারে। যেখানে ঐহিক জ্ঞানের প্রবলতাক্রমে বিচিত্রতা একেবারেই বিনষ্ট হলো, সেখানে 'চিন্মাত্র' শব্দ অচিৎ-এর অপসারণ হলে কেবল চিৎ এর বাক্য মাত্রে নির্দ্দেশক হয়ে অচিত-এর সহিত সমন্বয়-ভাববিশিষ্ট অর্থাৎ 'চিদাচিৎ-সমন্বয়' এই ঐহিক ধারণা তাঁদের পরলোকের ধারণা করতে দেয় না।

একাদশী তত্ত্ব ঃ একটি গবেষণামূলক বিশ্লেষণ

-শ্রী মনোরঞ্জন দে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কাত্যায়ন স্মৃতিতে বলা হয়েছে-

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী-দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে।

অর্থাৎ বিধবা হয়ে একাদশীতে ভোজন করলে তার সমস্ত পূন্য ক্ষয় হয় এবং দিনে দিনে ভ্রূণহত্যার পাপ হয়।

নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে-

একাদশীং বিনা রম্ভা যতিশ্চ সুমহাতপাঃ।
পচ্যতে হ্যন্ধতামিস্রে যাবদাহূতসং প্লবম॥

অর্থাৎ বিধবা এবং যতিগন (সন্ন্যাসীগণ) যদি একাদশীব্রত না করেন তাহলে তাদেরকে প্রবলয়র পূর্ব পর্যন্ত রন্ধ তামিস্র নরকে বাস করতে হয়।

একাদশী উপবাসের দিন নির্ণয় ঃ

শ্রীহরিভক্তিবিলাস সহ অপরাপর পুরানে শাস্ত্রে একাদশী দিন নির্নয় সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে বলা হয়েছে-

একাদশী চ সম্পূর্ণ বিদ্ধেতি দ্বিবিধা স্মৃতা
বিদ্ধাচ বিবিধা তত্র ত্যাজ্যা বিদ্ধা তু পূর্ব্বজ্যা।।

অর্থাৎ একাদশী দুই ধরনের ঃ

১। সম্পূর্না একাদশী

২। বিদ্ধা একাদশী।

বিদ্ধা আবার পূর্ব্ববিদ্ধা পরবিদ্ধা ইত্যাদি ভেদে অনেক রকম হয়। তার মধ্যে পূর্ব্ববিদ্ধা-অথাৎ দশমী বিদ্ধা একাদশী অবশ্যই পরিত্যাগ করবে। এই বিষয়ে দার্শনিক এর উক্তিও রয়েছে-

নাগবিদ্ধা তু যা ষষ্ঠী শিববিদ্ধা চ সপ্তমী।
দশম্যেকাদশীবিদ্ধা তত্র নোপদসেদবুধঃ

অর্থাৎ পঞ্চমী বিদ্ধা ষষ্ঠীতে, ষষ্ঠিবিদ্ধা সপ্তমীতে এবং দশমী বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা উচিত নয়। বিদ্ধা একাদশী কি এবং এরূপ একাদশী করা উচিত কি উচিত নয় সে সম্পর্কে তিনটি মত আমরা দেখতে পাই।

(ক) গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মত।

(খ) নিম্বার্ক সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব মত। (গ) স্মার্ত মত।

(ক) গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবরা অরুনোদয় বিদ্ধা অর্থাৎ দশমী বিদ্ধা একাদশীতে ব্রত করেন না। এই বিষয়ে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সহ বিভিন্ন পুরাণ শাস্ত্র এবং ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করা যায়। তার আগে আমাদেরকে অরুণোদয় সময় বলতে কি বুঝায় তা বুঝতে হবে।

বৈষ্ণব শাস্ত্রে ১মুহুর্ত বলতে ৪৮ মিনিট বুঝায়। আর এক দন্ড হলো ২৪ মিনিট। সুতরাং ৪ দন্ড = ২ মুহূর্ত হয়। এখন দেখা যাক অরুণোদয় বলতে কোন সময় বুঝায়। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে-

উদয়াৎ প্রাক চতস্রস্ত ঘটিকা অরুণোদয়ঃ
তত্র স্নানাং প্রশস্ত স্যাৎ স বৈ পুন্যতমঃ স্মৃতঃ॥

অর্থাৎ সূর্যোদয়ের পূর্বের চার দন্ড সময়কে = দুই মুহূর্ত) অরুণোদয় বলে। ঐ কাল অতি পুন্যতম। প্রাতস্নায়ী ব্যক্তির ঐ সময় স্নান করা প্রশস্ত। পাঠকের সুবিধার্থে নীচে উদাহরন দিয়ে অরুণোদয় সময়কাল বুঝানো হলোঃ

কাল্পনিক তারিখ	পরদিন সূর্যোদয়ের কাল্পনিক সময়	৪ দন্ডের সময় সীমা	অরুণোদয় সময়কাল
১	২	৩	৪= (২-৩)
২০-৪-২০০৬	৫-৩৭ মিঃ	১.৩৬ ঘন্টা	৪.০০-৫.৩৬ মিঃ
২০-৫-২০০৬	৫-৪০ মিঃ	১.৩৬ "	৪.০৩-৫.৩৯ মিঃ
২৫-৫-২০০৬	৬-৩৭ মিঃ	১.৩৬ "	৫.০০-৬.৩৬ মিঃ
৩০-৬-২০০৭	৬-৪১ মিঃ	১.৩৬ "	৫.০৪-৬.৪০ মিঃ

বিঃ দ্রঃ- মিঃ = মিনিট এবং সেঃ= সেকেন্ড বুঝতে হবে।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ মূলতঃ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী কর্তৃক রচিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ অনুযায়ী বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি অনুসারে করেন। উক্ত গ্রন্থসহ বিভিন্ন ঋষি এবং পুরাণ শাস্ত্রের বচন অনুসরণ এই সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ কখনো অরুণোদয় অথবা দশমী বিদ্ধা একাদশী ব্রত পালন করেন না। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে।

আদিত্যোদয়-বেলায়াঃ প্রাগুমুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥
অতএব পরিত্যাজ্যা সময় চারুনোদয়।
দশম্যেকাদশীবিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ॥

অর্থাৎ যদি সূর্যোদয়ের দুই মুহূর্ত অর্থাৎ চারিদন্ড পূর্ব থেকে একাদশী প্রবৃত্তি বা আরম্ভ হয় তাহলে ঐ একাদশীকে সম্পূর্না বলে। সূর্যোদয়ের পূর্বে চারিদন্ডের কম সময় একাদশী থাকলে বিদ্ধা বলে পরিগণিত হয়। অতএব অরুণোদয়ের সময় দশমী বিদ্ধা বা দশমী সংযুক্ত একাদশী বর্জন করবে। পরন্ত বৈষ্ণবের পক্ষে দশমী সংযুক্ত একাদশী সর্বদা পরিত্যাজ্য।

কন্বমুনি বলেছেন-

অরুনোদয়বেলায়াং দশমী-সংযুতা যদি।
অত্রোপোষ্যা দ্বাদশী স্যাৎ ত্রয়োদশ্যান্ত পারনম॥

অর্থাৎ অরুনোদয় সময়ে দশমীবিদ্ধা একাদশী হলে, দ্বাদশীতে উপবাস ও ত্রয়োদশীতে পারণ করতে হবে।

অরুনোদয় বিদ্ধা অথবা দশমী বিদ্ধা একাদশী করলে কি দোষারূপ হয় সে সম্পর্কে ঋষি এবং শাস্ত্রবাণী রয়েছে কৌৎস মুনি বলেন-

অরুনোদয় বেলায়া বিদ্ধা কাচিদুপোষিতা।
তং পুত্রশতং নষ্ট তস্যাং তাং পরিবর্জ্জয়েৎ।

অর্থাৎ কোন রমনী অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিয়া ছিল। সেই পাপে তার শতপুত্র বিনষ্ট হয়।

ভবিষ্যপুরাণে নিম্নোক্ত উক্তি রয়েছে-

অরুণোদয়কালে তু দশমী যদি দৃশ্যতে।
ন তত্রৈকাদশী কার্য্যা ধর্ম্মার্থকামনাশিনী॥

অরুনোদয়কালে দশমী যদি দৃশ্যতে।
পাপমূলং তদা জ্ঞেয়মেকাদশ্যপবাসিনাম॥

অর্থাৎ অরুনোদয়কালে যদি দশমী থাকে তাহলে একাদশীতে ব্রত না করে দ্বাদশীতে ব্রত করতে হবে। এই শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করে যদি কেই অরুনোদয়কালে দশমীবিদ্ধা একাদশী ব্রত করেন তার ধর্ম, অর্থ কাম ইত্যাদি বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অরুনোদয়কালে দশমীযুক্ত একাদশীতে উপবাস কেবলমাত্র পাপের কারণ হয়।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস গ্রন্থে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বলেছেন অরুনোদয়বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করা যায় এই ভাবেই যে সব বচন আছে সেগুলো অবৈষ্ণবপর বুঝতে হবে। অর্থাৎ অরুনোদয় বিদ্ধা একদশীতে বৈষ্ণব কখনো উপবাস করবেন না। ঐসব বচন "শুক্রমায়াকল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নয়।

এবং জ্ঞেয়ানি বাক্যনি বিদ্ধা ব্রত-পরানি তু।
অবৈষ্ণবাশ্রয়ান্যেব শুক্রমায়াকৃতানি বা॥

(শ্রীহরিভক্তি বিলাস)

এখন দেখা যাক সম্পূর্ণা একাদশী এবং দশমী বা অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশী আমরা কিভাবে নির্ধারণ করবো।

১। সম্পূর্ণ একাদশী নির্ধারণ ঃ যদি সূর্যোদয়ের চারিদন্ড অর্থাৎ দুই মুহূর্তে পূর্ব থেকেই একাদশী আরম্ভ হয় তাহলে সেই একাদশীকে সম্পূর্ণা বলা হয়। অন্যকথায় সূর্যোদয়ের পূর্ব চারদন্ডের বেশী সময় একাদশী থাকলে তাকে দশমী বিদ্ধা অথবা অরুনোদয় বিদ্ধা একাদশী বলা হয় না। একে সম্পূর্ণা একাদশী বলা যায়। বিষয়টি বোঝার জন্য নীচে নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ থেকে উদাহরন দেয়া হলো।

উদাহরণ ১। নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ সালের ১৪৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত দেখুন। ১৯-৪-২০০৫ ইং তারিখে মঙ্গলবার দশমী দিবা ১২/৪৬/৫৭ সেঃ পর্যন্ত ছিল। এরপর একাদশী আরম্ভ হয়। পরদিন অর্থাৎ ২০-৪-২০০৫ ইং তারিখ বুধবার দিবা ২/১৯/৫ ইং সেঃ পর্যন্ত একাদশী বিরাজমান ছিল। অর্থাৎ একাদশীর সময়সীমা ২৪ ঘন্টার বেশী ছিল। এখন ১ দন্ড =২৪ মিনিট। সুতরাং ৬০ দন্ড = ৬০ X ২৪= ১৪৪০ মিনিট = ২৪ ঘন্টা। অর্থাৎ একাদশী ৬০ দন্ড হলে অহোরাত্রব্যাপী হয়। একাদশী সম্পূর্না হতে হলে এর সময় সীমা কমপক্ষে ৬০ দন্ড হতে হবে। আমাদের উদাহরনে একদশীর সময়সীমা ২৪ ঘন্টার বেশী হওয়ায় এটি ৬০ দন্ড অতিক্রম করেছিল। আবার দশমী ১৯/৪/২০০৫ইং তারিখে দিনেই ছেড়ে দেয়। পরদিন পর্যন্ত ২০/৪/২০০৫ইং তারিখে সূর্য্যোদয় ছিল সকাল ৬/২৫/৩২ সেঃ গতে। তাই একাদশী অরুনোদয়ের বহুপূর্বে থেকেই প্রবৃত্তি আরম্ভ হয়েছিল। তাই একে অরুনোদয় অথবা দশমী বিদ্ধা বলা যাবে না। আবার একাদশীর সময় সীমাও ৬০ দন্ডের বেশী ছিল। এজন্য ২০/৪/২০০৫ইং তারিখে একাদশী সম্পূর্ণা একাদশী বলা যায়।

উদাহরণ ২। একই বইয়ের ১/৬/২০০৫ইং তারিখ দেখুন। ঐদিন ছিল বুধবার। এই দিন শেষরাত্রি ৪/৪৭/২ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরদিন ২/৬/২০০৫ইং বৃহস্পতিবার ৫/২৪/৪৭ সেঃ গতে সূর্য্যোদয় হয়েছিল। অরুনোদয়ের সময়সীমা ৪ দন্ড = ৪ X ২৪ = ৯৬ মিনিট = ১ঘন্টা ৩৬ মিনিট। এখন দেখতে হবে সূর্যোদয়ের সময় থেকে এই ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে যে সময় পাওয়া যাবে তার পূর্বে একাদশী আরম্ভ হয়েছিল কিনা। যদি হয় তাকে সম্পূর্ণা একাদশী বলা যাবে। নয়। এখন ৫/২৪/৪৭ সেঃ থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বাদ দিলে পাওয়া যায়। ৩/৪৮/৪৭ সেঃ। এখন এই সময়ের পূর্বে নয়। বরং আরম্ভ অর্থাৎ ৪/৪৭/২ সেঃ গতে একাদশী আরম্ভ হয়েছিল। তাই পঞ্জিকায় লিখিত ২/৬/২০০৬ইং তারিখ বৃহস্পতিবার একাদশী সম্পূর্ণ ছিলনা পারোক্ত একটি প্রফল হল একাদশী সময়সীমা ছিল বুধবার রাত্রি ৪/৪৮ মিঃ থেকে বৃহস্পতিবার রাত্র ৩/২৭ মিঃ পর্যন্ত যা ২৪ ঘন্টার কম। অর্থাৎ একাদশী ৬০ দন্ডের কম ছিল।

উদাহরণ ঃ (৩) একটি পঞ্জিকার ১৭/৭/২০০৫ ইং তারিখে রবিবার এর একাদশী লক্ষ্য করুন। ১৬/৭/২০০৫ইং শনিবার ছিল। এই দিন দিবাগত রাত্রি ৩/৬/৩৮ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। পরের দিন অর্থাৎ ১৭/৭/২০০৫ইং রবিবার সকাল ৫/৩৩/৩২ সেঃ গতে সূর্য্যোদয় ছিল। এখন এই সময় থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিঃ বিয়োগ করলে পাওয়া যায়। ৩/৫৭/৩২ সেঃ। এই সময়ের পূর্বেই একাদশী আরম্ভ হয়েছিল। কারণ পূর্ব দিন রাত্রি ৩/৬/৩৬ সেঃ গতেই একাদশী আরম্ভ হয়। তাই একাদশী অরুনোদয় বা দশমী বিদ্ধা হয় নাই। তাই এটি সম্পূর্ণ একাদশী বলা হয়।

২। অরুনোদয় বিদ্ধা/দশমী বিদ্ধা একাদশী নির্ণয় ঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা কখনো অরুনোদয় বিদ্ধা অথবা দশমী বিদ্ধা একাদশী করেন না। যদি সূর্যোদয়ের পূর্বে এই মুহূর্তের কম অর্থাৎ চার দন্ডের কম সময় একদশী থেকে তবে তাকে অরুনোদয় বিদ্ধা বা দশমী বিদ্ধা একাদশী বলে। সহজ কথায় সূর্য্যোদয়ের সময় থেকে চার দন্ড অর্থাৎ ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিয়োগ করতে হবে। বিয়োগ করলে যে সময় পাওয়া যাবে ঐ সময়ের পর্যন্ত যদি একাদশী থাকে তবে একাদশী দশমী অথবা অরুনোদয় বিদ্ধা বলে পরিগণিত হবে। এরূপ একাদশী না করে দ্বাদশী দিনে একাদশী করতে হবে বলে শ্রীহরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ সহ বিভিন্ন ঋষি এবং পুরাণ শাস্ত্রের বচন আছে যা পূর্বেই উল্লেখ করা রয়েছে। দশমী বিদ্ধা একাদশী কিভাবে বুঝা যাবে সে ব্যাপারে নীচে তিনটি উদাহরণ নবযুগ ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা ১৪১২ এবং লোকনাথ ডাইরী পঞ্জিকা ১৪১৩ থেকে দেয়া হল।

উদাহরণ ঃ (১) নবযুগ পঞ্জিকা ১৪১২ বাংলা-এর ১৭৩ পৃষ্ঠা দেখুন। পঞ্জিকায় বৃহস্পতিবার ১৯ শে মে ২০০৫ইং তারিখে একাদশী দেয়া আছে। অর্থাৎ স্মার্ত মতে একাদশী ঐদিন হবে। কিন্তু আগের দিন অর্থাৎ বুধবার ১৮ইং মে শেষ রাত্রি ৩/৫৬/১৬ সেঃ পর্যন্ত দশমী ছিল। বৃহস্পতিবার ১৯শে মে প্রাতে সূর্য্যোদয় ৫/২৭/১৯ সেঃ গতে ছিল। এখন এ থেকে ১ ঘন্টা ৩৬ মিনিট বিয়োগ করলে পাওয়া যায় বুধবারের রাত্রি ৪/৫১/১৯ সেঃ এখন বুধবার রাত্রে একাদশী আরম্ভ হয়েছিল ৩/৫৬/১৭ সেঃ থেকে (অর্থাৎ দশমী ছাড়ার পরে)। এখন দেখা গেল একাদশী ৪/৫১/১৯ সেঃ আরম্ভ হয়েছিল। ফলে এটি দশমী বিদ্ধা একাদশী ছিলনা। এই কারণে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৃহস্পতিবার দিনেই একাদশী করার কথা।

(চলবে)

যত নগরাদি গ্রামে

নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হলেন, শ্রীমৎ ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজ

হরেকৃষ্ণ নিউজ ব্যুরো ঃ আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, গত ১ অক্টোবর ২০০৬ রাত বারোটা পনের মিনিটে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইস্কন) অন্যতম আচার্য, জিবিসি এবং 'ভক্তিবেদান্ত ইন্সটিটিউটের' আন্তর্জাতিক সঞ্চালক ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী মহারাজ কলকাতায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকস্মাৎ নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট হয়েছেন। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৯ বৎসর। বিশদ বিবরণে প্রকাশ যে, ঐদিন দশটা পর্যন্তও তিনি বেশ হাসিখুশী ছিলেন। তিনি তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। গত ডিসেম্বর মাসে 'ভক্তিবেদান্ত ইন্সটিটিউটে'র আয়োজনে পুরীতে যে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সম্মেলন হয়েছিল তার প্রস্তুতি বিষয়ে ভক্তদের সঙ্গে মিটিং করেছিলেন। ঐ দিন রাত দশটা- সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি তাঁর ঘরে ঘুমোতে চলে যান। কিন্তু রাত বারোটার একটু আগে তিনি তাঁর-সেবক ব্রজেন্দ্র কুমার প্রভুকে ডেকে বলেন তাঁর ডান বাহুতে হঠাৎ অসহ্য ব্যথা শুরু হয়েছে এবং তাঁর শ্বাস নিতেও অসুবিধা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারকে ফোন করা হয়। কিন্তু ডাক্তার এসে পৌছাবার পূর্বেই শ্রীমৎ ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী মহারাজ আমাদের এই নশ্বর জগত ছেড়ে ভগবদ্ধামে চলে যান।

শ্রীমৎ ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী মহারাজের এই আকস্মিক মহাপ্রয়াণে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল। যেহেতু মহারাজ নিজেও ছিলেন বিজ্ঞানী, তাই শ্রীল প্রভুপাদ বিজ্ঞানসম্মতভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দর্শনকে সারা পৃথিবীর বিদ্বৎ সমাজের কাছে ভক্তিবেদান্ত ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে প্রচার করার গুরুদায়িত্ব শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজের উপর ন্যস্ত করেছিলেন।

১৯৩৭ সনের ৯ ডিসেম্বর ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের এক পাহাড়ী রাজ্য মনিপুরের তৌবুল গ্রামে এক দরিদ্র বৈষ্ণব পরিবারে শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পূর্বাশ্রমে তাঁর নাম ছিল থৌডম দামোদর সিং। শৈশব থেকেই পিতৃহারা থৌডম দামোদরকে দরিদ্রতার সঙ্গে সংগ্রাম করে জীবন পথে এগোতে হয়েছে এবং শৈশবেই তিনি ছিলেন মেধাবী ছাত্র। তিনি বিদেশে গবেষণার জন্য ভারত সরকারের মেধা বৃত্তি লাভ করে আমেরিকার প্রখ্যাত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইরভাইন থেকে অরগানিক কেমিস্ট্রি বিষয়ে গবেষণা করে ১৯৭৪ সালে পি এইচ ডি ডিগ্রী প্রাপ্ত হন। ১৯৭০ সনে আমেরিকার লস এঞ্জেলসে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সাক্ষাতই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৯৭১ সালের ৩০ জুন শ্রীল প্রভুপাদের কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করে, সমস্ত পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগদান করতে চান। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ তাঁকে দীক্ষা দিলেও তাঁর পড়াশোনা বা গবেষণার কাজ ছাড়তে নিষেধ করেন। বরং তিনি তাঁকে, নিজেকে বৈজ্ঞানিকরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে, ভবিষ্যতে কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শনকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহলে প্রচারিত করার নির্দেশ দেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশ শিরোধার্য করে ১৯৭৬ সালে তাঁর বিজ্ঞান গবেষণার সাফল্যের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ণভাবে ইস্কনে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তারপর 'ভক্তিবেদান্ত ইন্সটিউট' গঠন করে, সংস্থার আন্তর্জাতিক সঞ্চালনরূপে পৃথিবীর বিজ্ঞান মহলে কৃষ্ণভাবনামৃত দর্শন যে প্রকৃতপক্ষে একটি বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন- তার প্রমাণ ও প্রচার করতে থাকেন। শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশিত এই প্রচার কার্য ছাড়াও তিনি মণিপুরে ইস্কনের একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন যা, শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণচন্দ্র মণিমন্দির নামে পরিচিত। ১৯৭৯ সনে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং শ্রীমৎ ভক্তিস্বরূপ দামোদর স্বামী মহারাজ নামে পরিচিত হন।মহারাজের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর শুদ্ধ দেহকে বৃন্দাবনের পবিত্র রাধাকুণ্ডের তীরে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁর পুত দেহকে বৃন্দাবনের উদ্দেশ্যে বিমানে দিল্লী নিয়ে আসা হয়। দিল্লী বিমানবন্দরে শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী মহারাজের নেতৃত্বে প্রায় একশত ভক্ত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সংকীর্ত্তনের মাধ্যমে দামোদর মহারাজের দেহকে গ্রহণ করেন। অবশেষে সকলের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে দামোদর মহারাজের পবিত্র দেহবহনকারী এ্যাম্বুলেন্স রাত ৯টা ১৫ মিঃ কৃষ্ণ-বলরাম মন্দিরে প্রবেশ করে। সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে সমবেত ভক্ত ও জনসাধারণের মধ্য থেকে বারবার ধ্বনি ওঠে 'জয় শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ কি জয়!'এরপর মহারাজের দেহকে শ্রীল প্রভুপাদের সমাধি মন্দিরে নিয়ে গিয়ে শ্রীল প্রভুপাদের বিগ্রহের সম্মুখে তাঁর প্রিয় শিষ্যের দেহকে সকলের শেষ দর্শনের জন্য স্থাপন করা হয়। এরপর এক দীর্ঘ শোভাযাত্রা সহকারে হরিনাম সংকীর্ত্তন এবং ঘন ঘন 'শ্রীপাদ দামোদর মহারাজ কী জয়' ধ্বনির মাধ্যমে মহারাজের দেহকে রাধাকুণ্ডের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়।

রাধাকুণ্ডে পৌছে রাধাকুণ্ডের তীরে অবস্থিত মণিপুরের এক প্রাচীন মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে অবশ্য এই মন্দিরটি মণিপুরের বর্তমান রাজপরিবার শ্রীপাদ ভক্তিস্বরূপ দামোদর মহারাজকে দান করেছিলেন। ঐ মন্দিরে দামোদর মহারাজের আরতির পর মহারাজের দেহ নিয়ে ভক্তগণ রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড পরিক্রমা করেন। এরপর মহারাজের দেহকে গোপালজী মন্দিরের এক বিস্তৃত চত্বরে সমাধিস্থ করার নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের গুরুভ্রাতা শ্রীল ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের শিষ্য, বৃন্দাবনের গোপীনাথ গৌড়ীয় মঠের শ্রীমৎ বোধায়ণ মহারাজ, দামোদর মহারাজের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অন্যান্য ভক্তরা তাঁকে সেই কাজে যেমন- অভিষেক, সজ্জা, মহারাজের অঙ্গে তিলক ও হরিনাম ধারণ ইত্যাদিতে সহযোগিতা করেন। এই সময়ে শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী, শ্রীমৎ লোকনাথ স্বামী এবং শ্রীমৎ নবযোগেন্দ্র স্বামী অবিরাম কীর্তন করে চলেন। অবশেষে দামোদর মহারাজকে তাঁর সমাধিস্থলে নামিয়ে দেওয়া হয়।

শ্রীশ্রী রাধা-মাধব এবং সখীবৃন্দ

শ্রীশ্রী নৃসিংহ দেব

শ্রীশ্রী পঞ্চতত্ত্ব

শ্রীল এ.সি.ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর

শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী

শ্রীল ষড়্‌গোস্বামী

Calendar-2007

January

S	S	M	T	W	T	F
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14		16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28		30	31		

February

S	S	M	T	W	T	F
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13		15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26		28		

March

S	S	M	T	W	T	F
31					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14		16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28		30

April

S	S	M	T	W	T	F
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
	29	30				

May

S	S	M	T	W	T	F
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12		14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26		28	29	30	31	

June

S	S	M	T	W	T	F
30						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10		12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25		27	28	29

July

S	S	M	T	W	T	F
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10		12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25		27
28	29	30	31			

August

S	S	M	T	W	T	F
				1	2	3
4	5	6	7	8		10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	
25	26	27	28	29	30	31

September

S	S	M	T	W	T	F
1	2	3	4	5	6	
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22		24	25	26	27	28
29	30					

October

S	S	M	T	W	T	F
		1	2	3	4	5
	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21		23	24	25	26
27	28	29	30	31		

November

S	S	M	T	W	T	F
					1	2
3	4		6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20		22	23
24	25	26	27	28	29	30

December

S	S	M	T	W	T	F
1	2	3	4		6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19		21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিপ্রেক্ষিতে

সিন্ধু থেকে হিন্দু হলেও ধর্মের নাম হিন্দু'নয় (দ্বিতীয় পর্ব)

-শ্রী অশ্বিনী কুমার সরকার

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মহানায়ক মহাবীর অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে 'সনাতন পুরুষ' এবং 'শাশ্বত' ধর্মের প্রতিপালক বলে উল্লেখ করেছিলেন (গীতা-১১/১৮)। উল্লেখ্য, 'শাশ্বত'ও 'সনাতন'একই অর্থপ্রকাশক দু'টি শব্দ। তাছাড়া গীতা ১৪শ অ-২৭ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে, তিনি সনাতন ধর্মের মূল এবং প্রতিষ্ঠাতা। ধর্ম সংস্থাপনার্থে তিনি যুগে যুগে সৃষ্টিতে (বহুরূপে) অবতীর্ণ হয়েছেন (গীতা ৪র্থ অ-১/৭/৮ শ্লোক)। কখনো স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে; আবার কখনো বা মুনি-ঋষিদের মাধ্যমে তিনি এ সনাতন (শ্বাশ্বত) ধর্মের সংস্থাপনকার্য সম্পাদন করেছেন। সনাতন পুরুষ যে ধর্মের মূল ও প্রতিষ্ঠাতা, সে ধর্মের নাম 'সনাতন'ব্যতীত অন্য কিছু রাখা কি সমীচীন? রামায়ণ, মহাভারত ও মনুসংহিতায়ও ধর্মের নাম হিসেবে একাধিকবার 'সনাতন' শব্দের উল্লেখ রয়েছে। কুরুক্ষেত্র মহসমরের অবসানে ক্লান্ত ও শোকাতুর মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণসহ শর শয্যাশায়ী পিতামহ ভীষ্মদেবের নিকট শান্তি লাভের জন্য যখন উপদেশপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হন, তখন তিনি (ভীষ্মদেব) ধর্মের নাম হিসেবে 'সনাতন' কথাটিই উচ্চারণ করেছিলেন। পান্ডবভ্রাতৃগণকে ধর্মোপদেশ প্রদানের শুরুতেই তিনি বলেছিলেনঃ

"নমো ধর্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্মান্ বক্ষ্যামি শাশ্বতান্ ॥"

মহাভারত, শান্তিপর্ব ৫৫/১১)

-'মহান্ ধর্মকে নমস্কার, জগদ্ বিধাতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম, ধর্মরহস্যজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নমস্কার জানিয়ে আমি বেদপরম্পরাগত সনাতন ধর্মের ব্যাখ্যা শুরু করছি'। মহামহিম ভীষ্মদেব শান্তিপর্বে আরও বলেছেনঃ

"এষ ধর্মো জগন্নাথাৎ সাক্ষন্নারায়ণান্নৃপ!
এবমেষ মহান্ ধর্ম আদ্যো রাজন্ সনাতন।"

-'স্বয়ং গোলেকেশ্বর নারায়ণ এই ধর্মের প্রবক্তা ও প্রতিষ্ঠাতা। যুগে যুগে অবতাররূপে বা ঋষিদের মাধ্যমে এই শাশ্বত সনাতন ধর্মই প্রচারিত হয়ে আসছে'। ঋষি বিশ্বামিত্র মহারাজ দশরথকে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করেছিলেন, তার স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে রামায়ণে। যেমন-"রাজ্যভার নিযুক্তানাম্ এষ ধর্মঃ সনাতন।" মহাজ্ঞানী গৌতম বুদ্ধের সময়েও মানুষের নিকট ধর্মের নাম হিসেবে 'সনাতন ধর্ম' কথাটি অবিদিত ছিল না। সেকারণে তিনিও তাঁর প্রচারিত ধর্মকে 'সনাতন ধর্ম' নামেই অভিহিত করেছিলেন। ধর্ম্মপদে তিনি বলেছেনঃ

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তী'ধ কুদাচনং,
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধর্ম্মো সনন্তনো।" (ধম্মপদ ৫)

-'জগতে শত্রুতার দ্বারা কখনও শত্রুতার উপশম হয় না, মিত্রতার দ্বারাই শত্রুতার উপশম হয়। এটাই সনাতন ধর্ম'। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, "জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব সেবা, এর চেয়ে নাহি আর ধর্ম সনাতন।" এ যুগের অন্যতম ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহারাজ ১৯৭৫ খৃষ্টীয় সালে নারায়ণগঞ্জে সনাতন ধর্ম মহাসম্মেলন করে সনাতন ধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্যই "সনাতন ধর্ম মহামন্ডল"প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "হিন্দু নামটা শাস্ত্রীয় নয়, সংস্কৃতও নয়-এটা একটা ডাকনাম মাত্র। কী হেতু কে প্রথম এ নামটি ধরে আমাদের ডেকেছিল তা অনুসন্ধিৎসার ব্যাপার। আমাদের ধর্মের শাস্ত্রীয় নাম 'সনাতন ধর্ম।"

বর্তমান যুগ মানবতা ও মানবাধিকার সমুন্নত রাখার যুগ। জাতিসংঘের অন্যতম বিঘোষিত নীতিই হলো মানবাধিকার সমুন্নত রাখা। আর আমাদের প্রায় সকলেরই জানা আছে যে, সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ 'মন' থেকে (আসলে ব্রহ্মান্ডের প্রথম দেবতা প্রজাপতি ব্রহ্মার মন থেকে) মনু, মুনি, মানব, মানুষ, মানবতা, মানবাধিকার, মানবতন্ত্র (গণতন্ত্র) ইত্যাদি শব্দগুলো সমুৎপন্ন হয়েছে। 'মুনি'অর্থ মননশীল ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব তথা চিন্তাবিদ, দার্শনিক, দ্রষ্টা কিংবা ঋষি। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে 'মনু' নামের এরূপ চৌদ্দজন আদি মুনির নাম উল্লেখ দেখা যায়। মুনি-ঋষিদের কাজই ছিল তপস্যালব্ধ জ্ঞানালোকে মনুষ্যত্বের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে মানব জাতির আধ্যাত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতি লাভের ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখা। অবশ্য তাঁরা তা রেখেছিলেন। আর সেকারণেই ভারতবর্ষের কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে 'সনাতন ধর্মের' পাশাপাশি "মানব ধর্ম" কথাটিও উল্লেখ দেখা যায়। মানুষের ধর্ম হিসেবে এ কথাটা ঋষি মনু উল্লেখ করেছিলেন। তবে মানুষের ধর্মকে 'মানব ধর্ম' হিসেবে গণ্য করা মোটেই অযৌক্তিক কিছু নয়। আর জাতি সৃষ্টির অগ্রে সৃষ্টি বিধায় এ ধর্ম আসলে মানবতাবাদীও। ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও সংজ্ঞার মধ্যেও এ মানবতার সুর স্পষ্টভাবে বিধৃত। ব্যাকরণমতে "ধৃ"ধাতুর সাথে 'মন্' প্রত্যয় যোগে ধর্ম শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ বা ধরা-এ ক্ষেত্রে 'ধরে রাখা' এবং 'ধরে থাকা' দু'টোই বোঝায়। সুতরাং চঞ্চল মনকে যথাযথভাবে সংযত করে জীবন, বৃদ্ধি ও মানবতাকে যা সুশৃঙ্খলভাবে ধরে রাখে এবং যা ঐকান্তিকভাবে ধরে না থাকলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, তাই ধর্ম। এটি শাব্দিক অর্থ হলেও ভাগবতে ধর্মকে ঈশ্বরের আইন তথা আদেশ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ধর্মের সংজ্ঞা সম্পর্কে সত্যদ্রষ্টা ঋষি ও মহাত্মাগণের সিদ্ধান্ত বস্তুত এরূপই। শাব্দিক অর্থের বিষয়টা

একটু অভিনিবেশ সহকারে ভাবলেও বোঝা যায় যে, মানবতা ও মানবাধিকার আন্দোলনে বর্তমান যুগের হিন্দুদের অবদান রাখার সুযোগই সবথেকে বেশি উন্মুক্ত ও বিস্তৃত। অথচ বাস্তব অবস্থা একেবারেই ভিন্ন। মানবাধিকার তথা ধর্মীয় চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে একালের হিন্দুদের অবস্থান যেখানে হওয়ার কথা, সেখানে তাদের দেখা যায় না। বিশ্ব হিন্দু পরিষদভুক্ত হিন্দুরা অন্যদের থেকে যে বহুগুণে পেছনে পড়ে আছে, তা তারা স্বীকার না করলেও বাস্তব অবস্থা কিন্তু তার প্রমাণ দিচ্ছে। মানবতাবাদের পরিবর্তে উগ্রতা, হিংস্রতা ও বংশানুক্রমিক বর্ণবাদকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়ে যাচ্ছে ধর্মের নামে। এটা শুধু আশ্চর্য ব্যাপার নয় - অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং লজ্জাকর ব্যাপারও। ধর্মের নামে হিংসা, বিদ্বেষ কিংবা উত্তেজনা ছড়ায়ে শান্তি বিনষ্ট করা কি সমীচীন? এসব কাজ কি ধর্মের মূলনীতি ও লক্ষ্যের সাথে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ বলা যায়? বুৎপত্তিগত অর্থ আর প্রাচীন গ্রন্থাদির কথা না হয় বাদই দিলাম। কিন্তু বর্তমান যুগে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে তো "মানবতাবাদ" ধর্ম হিসেবে একটা স্বীকৃত বিষয়। এ স্বীকৃতি দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। (তথ্যসূত্রঃ সংবাদ ৪-৯-২০০২) Judicial decision তথা উচ্চ আদালতের রায়ও আইন হিসেবে গণ্য হয়। এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েও তো মানবতাবাদকে সামনে নিয়ে আসা যায় এবং যা ধর্মের মূলনীতির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ বটে। তা না এনে হিন্দুত্বের নামে কেবল উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে কেন, তা বোধগম্য নয়। এটা জন্মগত বর্ণবাদ আড়াল করার কোন অপকৌশল নয়তো? উল্লেখ্য, কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ তাঁর বন্ধু পন্ডিত নেহরুকে কথাপ্রসঙ্গে একবার বলেছিলেন যে, "ভারতে যদি জন্মগত বর্ণবাদ প্রশ্রয় না পেত তাহলে ধর্মান্তরের ক্ষেত্র কখনোই প্রস্তুত হতো না। আর ধর্মান্তর ব্যতীত বর্তমান কাশ্মীরও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে পরিণত হতো না।" নেহরু এ বিষয়ে তাঁর সাথে অভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। উল্লেখ্য, কোন মহামানবই জন্মগত বর্ণপ্রথা সমর্থন করেননি। আর আমরা ইতিহাস পুরাণেও দেখি, বৈদিক যুগের মুনি-ঋষি থেকে শুরু করে আধুনিক ভারতের মহান স্থপতি মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সকল মহামানবই সমাজজীবনের জন্মগত বর্ণবৈষম্য প্রথা নির্মূলের পক্ষে ছিলেন।

হিন্দুত্ববাদের শ্লোগানের মাধ্যমে সহিংসতার প্রসার ঘটানো কিংবা উত্তেজনা ছড়ানো সম্ভব হলেও ধর্মান্তর রোধ করা আদৌ সম্ভব নয়। সেটা সম্ভব হলে এ একবিংশ শতাব্দীতে গুজরাটের দলিত হিন্দুরা দলবেঁধে ধর্মান্তরিত হতো না। গত ৫ই অক্টোবর ২০০৩, গুজরাটের দলিত বা অস্পৃশ্য বলে কথিত হিন্দু সম্প্রদায়ের ৬ হাজার সদস্য একযোগে স্বধর্ম ত্যাগ করে চলমান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছেন। (তথ্যসূত্রঃ ভোরের কাগজ ১৯.১০.০৩) হিন্দু সমাজ থেকে ধর্মান্তর কি নতুন কোন সমস্যা? অবিভক্ত ভারতবর্ষে বৃহত্তর ফরিদপুর (বর্তমানে শরীয়তপুর) জেলার গোসাইরহাট উপজেলাস্থ দাসের জঙ্গল গ্রামের শশীকান্ত ভট্টাচার্যের পুত্র সুদর্শন ভট্টাচার্য ১৯৩৭ খৃষ্টীয় সালে মাত্র ২১ বছর বয়সে ধর্মান্তরিত হয়ে আবুল হোসেন ভট্টাচার্য নাম ধারণ করেছিলেন। আর ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজশাহীর নয়নচাঁদ রায় ভাদুড়ির পুত্র কালাচাঁদ রায় (ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত) ধর্মান্তরিত হয়ে কালাপাহাড় নাম ধারণ করেছিলেন। ইতিহাস আজও তার প্রমাণ বহন করে চলেছে। মেনে নিলাম স্বেচ্ছায় যে কেউ ধর্মান্তরিত হতে পারেন। কিন্তু আমাদের সমাজের বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদেরকেও (বিশেষকরে বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির সভাপতি শ্রী শিবশঙ্কর চক্রবর্তী মহোদয়কে) অহরহই "ধর্মান্তর নেই" বলতে শোনা যায়। চক্রবর্তী মহোদয় তার সম্পাদিত সমাজ দর্পনের মাধ্যমে বারবারই এ কথা চলেছেন। তিনি কেন কিংবা কোন উদ্দেশ্যে তা বলে চলেছেন, তা আমার কাছে মোটেই স্পষ্ট নয়। আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ধর্মান্তর স্বীকার করে বলেই তো তার দরজা সবার জন্য উন্মুক্ত। আর কৃষ্ণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যারা এর সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাদের আত্মিক উন্নতির পথেও ইস্‌কনে কোন বাঁধা রাখা হয়নি। যথাযথ যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে তাদের সবারই (গারো, হাজং, সাঁওতাল, ত্রিপুরা, মিজো, নাগা, মনিপুরী, খাসিয়া, চাকমা হলেও) ব্রাহ্মণ (বৈষ্ণব/ব্রহ্মচারী/মহারাজ) পদে উন্নীত হওয়ার পূর্ণ সুযোগ রয়েছে।

ধর্মের নাম দিয়ে যে বিতর্ক, সমাজের স্বার্থে দ্রুতই তার অবসান হওয়া উচিত। কিন্তু তা কেন যে হচ্ছে না, তা আমার কাছে বোধগম্য নয়। এ যুগের দু'জন শ্রেষ্ঠ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের (ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী এবং ইস্‌কনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য শ্রীল এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ) সিদ্ধান্ত মেনে নিলে এ প্রশ্নে কোন বিতর্ক থাকার কথা নয়। উৎস বিবেচনায় ধর্মের নাম বৈদিক ধর্মও হতে পারে। তবে বর্তমানে বেদই কেবল অধিকাংশ হিন্দুর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ নয়। তদুপরি অহিংসাবাদও এখন ধর্মের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। অন্যদিকে নামকরণ প্রশ্নে 'মানব ধর্ম' তথা মানবতাবাদের প্রসঙ্গও আসে। তবে মানবতাবাদে কেবল মানুষের শান্তি ও কল্যাণচিন্তাই প্রাধান্য পেতে দেখা যায়। সেদিক থেকে অহিংসবাদ সংবলিত ধর্মের ক্ষেত্র বস্তুত আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক। মনুষ্যকুলসহ জগতের সকল জীবের শান্তি ও কল্যাণ কামনাই এর মধ্যে পড়ে। এসব বিষয় বিবেচনা করেই ভূ-দান যজ্ঞের পুরোধা আচার্য বিনোবা ভাবে "জয় হিন্দ" বলতেন না; বলতেন "জয় জগৎ"। উল্লেখ্য, বিনোবাজি এবং শ্রীল প্রভুপাদ ধর্মের সার্ব্বজনীন চরিত্র অক্ষুন্ন রাখার জন্যই 'হিন্দ' শব্দকে ধর্মের সাথে জড়াননি। হিন্দুরা যেমন - তেমনি অন্যেরাও সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-নীতি ও আচার-অনুষ্ঠান-নির্দেশ মেনে ইস্‌কন প্রচারিত 'সনাতন ধর্ম' অনুসরণ করতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবত

শ্রীমদ্ভাগবত হল প্রাচীন ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারের সারাতিসার। পাঁচ হাজার বছর আগে মহামুনি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস পারমার্থিক জ্ঞানের সারভাগ ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে এই অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করেন। এখানে মূল সংস্কৃত শ্লোকের সঙ্গে, আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত শব্দার্থ, অনুবাদ এবং তাৎপর্যও উপস্থাপন করা হলো। এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করা হচ্ছে-

প্রথম স্কন্ধ ঃ "সৃষ্টি"

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

শ্লোক ৩৫

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্। ৩৫।

যৎ-যা কিছু; **অত্র**-এই জীবনে বা জগতে; **ক্রিয়তে**-অনুষ্ঠান করা হয়; **কর্ম**-কর্ম; **ভগবৎ**-পরমেশ্বর ভগবানকে; **পরিতোষণম্**-সন্তুষ্টির জন্য; **জ্ঞানম্**-জ্ঞান; **যৎ**-তৎ-যা কিছু; **অধীনম্**-অধীন; **হি**-অবশ্যই; **ভক্তি-যোগ**- ভক্তিযোগ; **সমন্বিতম্**-সমন্বিত হয়।

অনুবাদ

এই জীবনে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা, এবং সব রকমের জ্ঞান তখন তার অধীনে তত্ত্বরূপে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়।

তাৎপর্য

সাধারণত মানুষ মনে করে যে শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে সকাম কর্ম করার ফলে পরম-তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার পারমার্থিক জ্ঞান পূর্ণরূপে লাভ করা যায়। কেউ মনে করে যে, ভক্তিযোগ হচ্ছে আরেক ধরণের কর্ম। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভক্তিযোগ কর্ম এবং জ্ঞানের অতীত। ভক্তিযোগ জ্ঞান অথবা কর্ম থেকে স্বতন্ত্র; পক্ষান্তরে, জ্ঞান এবং কর্ম হচ্ছে ভক্তিযোগের অধীন। এই ক্রিয়াযোগ অথবা কর্মযোগ, যে সম্বন্ধে শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে নির্দেশ দিচ্ছে তা বিশেষভাবে অনুমোদন করা হয়েছে, কেন না তার উদ্দেশ্যে হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা। ভগবান চান না যে তাঁর সন্তানেরা অর্থাৎ জীবেরা জড় জগতের ত্রিতাপ দুঃখ ভোগ করুক, তিনি চান যে তারা সকলেই যেন তাঁর কাছে ফিরে গিয়ে তার সঙ্গে বাস করে। কিন্তু ভগবানের কাছে ফিরে যেতে হলে সব রকম জড় কলুষ থেকে মুক্ত হতে হয়। তাই ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যখন কর্ম করা হয় তখন সেই কর্মের প্রভাবে জীব ধীরে ধীরে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। এইভাবে পবিত্র হওয়ার অর্থ হচ্ছে পারমার্থিক জ্ঞান লাভ করা। তাই জ্ঞান পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্য সাধিত কর্মের অধীন। অন্যান্য জ্ঞান ভগবদ্ভক্তিবিহীন হওয়ার ফলে ভগবানের রাজ্যে নিয়ে যেতে পারে না, অর্থাৎ তা মুক্তি পর্যন্ত দান করতে পারে না, যা ইতিমধ্যে নৈষ্কর্ম্যপচ্যুত-ভাববর্জিতম" শ্লোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ভক্ত ভক্ত যখন অনন্য ভক্তি সহকারের ভগবানের সেবায় যুক্ত হন, বিশেষ করে ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনে তখন ভগবৎ-কৃপার প্রভাবে তিনি দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, যা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে।

শ্লোক ৩৬

কুর্বাণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ ॥ ৩৬

কুর্বাণাঃ-সম্পাদন করার সময়ে; **যত্র**-যখন; **কর্মাণি**-কর্ম; **ভগবৎ**-পরমেশ্বর ভগবান; **শিক্ষয়া**-উপদেশের দ্বারা; **অসকৃৎ**-বারংবার; **গৃণন্তি**-কীর্তন করা; **গুণ**-গুণাবলী; **নামানি**-নামসমূহ; **কৃষ্ণস্য**-শ্রীকৃষ্ণের; **অনুস্মরন্তি**-নিরন্তর স্মরণ করেন; **চ**-এবং।

অনুবাদ

ভক্ত যখন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে কর্ম করেন, তখন তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্তন করেন এবং স্মরণ করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের সুদক্ষ ভক্ত তাঁর জীবন এমনভাবে গড়ে তুলতে পারেন যে ইহ জীবনের জন্য অথবা পর জীবনের জন্য তাঁর সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করার সময়ও তিনি নিরন্তর ভগবানের নাম, গুণ, লীলা ইত্যাদি নিরন্তর স্মরণ করতে পারেন। ভগবান ভগবদ্গীতায় স্পষ্টভাবে তার নির্দেশ দিয়ে গেছেনঃ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য হচ্ছে কেবল ভগবানে জন্যই কর্ম করা এবং ভগবানেরই সব কিছুর মালিকরূপে অধিষ্ঠিত করা। বৈদিক অনুশাসন অনুসারে, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, সরস্বতী, দুর্গা, গণেশ ইত্যাদি দেবদেবীর পূজার সময়ও পরম পূজ্য যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর বিগ্রহ 'শালগ্রাম-শিলার' পূজা হয়। শাস্ত্রে বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তা হলেও সেই পূজা যথাযথভাবে সম্পাদন করা জন্য শ্রীবিষ্ণুর উপস্থিতি সর্বতোভাবে আবশ্যক।

এই ধরণের বৈদিক কার্যকলাপ ছাড়াও, সাধারণ কার্যকলাপেও (যেমন আমাদের গৃহস্থালির কার্যে অথবা ব্যবসায় অথবা পেশায়) আমাদের সমস্ত কর্মের ফল পরম ভোক্তা, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অর্পণ করার কথা বিবেচনা করা উচিত। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ঘোষণা করেছেন যে, তিনিই সব কিছুই পরম ভোক্তা, তিনিই হচ্ছেন সর্বলোক মহেশ্বর এবং তিনিই হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম সুহৃদ। শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কেউই এই জগতের সব কিছুর ঈশ্বর বা মালিক বলে দাবি করতে

পারে না। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত নিরন্তর সে কথা স্মরণ করেন এবং তা করার সময় তিনি ভগবানের দিব্য নাম, মহিমা এবং গুণাবলী বারংবার উচ্চারণ করেন। তাঁর ফলে তিনি সর্বদাই পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। ভগবানের নাম, গুণ ইত্যাদি তাঁর থেকে অভিন্ন এবং তাই তাঁর নাম ইত্যাদি সঙ্গে নিরন্তর যুক্ত থাকার অর্থ হচ্ছে ভগবানেরই সঙ্গে যুক্ত থাকা।

আমারা যে অর্থ উপার্জন করি তার অধিকাংশ অন্তপক্ষে অর্ধাংশ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা এবং বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা উচিত। সেই উদ্দেশ্য আমাদের উপার্জিত অর্থ দান করাই যথেষ্ট নয়, ভগবদ্ভক্তির বাণী প্রচারের আয়োজন করাও আমাদের কর্তব্য; কেন না সেটি ভগবানের একটি আদেশ। ভগবান স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে যাঁরা তার মহিমা প্রচারের কাজে নিরন্তর যুক্ত, তাঁরা হচ্ছেন তাঁর সব চাইতে প্রিয়, তাদের থেকে প্রিয় আর কেউ নেই। ভগবানের সেই নির্দেশ পালন করার জন্য জড় জগতের বৈজ্ঞানিক আবিস্কারগুলিরও নিয়োগ করা যেতে পারে। তিনি চান যে ভগবদ্গীতায় বাণী যেন তাঁর ভক্তদের কাছে প্রচারিত হয়। জ্ঞান, দান, তপশ্চযা ইত্যাদি দ্বারা যাদের হৃদয় নির্মল হয়নি, তারা সাধারণত ভগবানের বাণী গ্রহণ করতে পারে না। তাই অনিচ্ছুক মানুষকেও ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার চেষ্টা করতে হবে। সে বিষয়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এক অতি সরল পন্থার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তিনি ভগবানের সেই অপ্রাকৃত বাণী কীর্তন, নর্তন এবং প্রসাদ-সেবনের মাধ্যমে প্রচার করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন; এইভাবে আমাদের উপার্জনের অর্ধাংশ এই উদ্দেশ্যে ব্যয় করা যেতে পারে। কলহ এবং বিভেদের যুগ এই কলিযুগে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা অনুসারে সমাজের নেতৃস্থানীয় এবং বিত্তশালী ব্যক্তিরা যদি তাদের উপার্জনের অর্ধাংশ ভগবানের সেবায় ব্যয় করেন, তা হলে নিঃসন্দেহে পৃথিবীর এই নারকীয় পরিবেশকে ভগবদ্ধামের অপ্রাকৃত পরিবেশে রূপান্তরিত করা যায়। যে অনুষ্ঠানে সুন্দর নাচ-গান হয় এবং সুস্বাদ খাবার দেওয়া হয়, সেই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে কেউই অসম্মত হবে না। এই ধরনের অনুষ্ঠানে সকলেই যোগ দেবে এবং সেখানে সকলেই ব্যক্তিগতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য উপস্থিতি অনুভব করতে পারবে। এইভাবে সেই অনুষ্ঠানে যোগদানকারীরা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গ লাভ করবে এবং তার ফলে পবিত্র হয়ে পারমার্থিক তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। এই ধরনের পারমার্থিক কার্যকলাপ সফলতার সঙ্গে সম্পাদন করার একটি শর্ত রয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে, তা যেন সব রকমের জড় কামনা-বাসনা থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়। ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত কেবল জড় কামনা-বাসনা থেকেই মুক্ত নন, তিনি সকাম কর্ম এবং ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত শুষ্ক জ্ঞানের প্রভাব থেকেও মুক্ত। ভগবানের প্রকৃতি সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করার কোনও প্রয়োজন নেই। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে এবং বিশেষ করে ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজে তাঁর তত্ত্ব প্রকাশ করে গেছেন। আমাদের কেবল তা যথাযথভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং ভগবানের নির্দেশ পালন করতে হবে। তা হলেই তা আমাদের পূর্ণতা প্রাপ্তির পথে পরিচালিত করবে। যে যেখানে রয়েছে সেখানেই থাকতে পারে। কারোরই তার নিজ নিজ অবস্থা বা বৃত্তি পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই, বিশেষ করে এই কলিযুগে। তবে পরম-তত্ত্ব সম্বন্ধে মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, সেই অভ্যাসটি বর্জন করতে হবে। এই ধরনের গর্বোদ্ধত প্রচেষ্টা র্বজন করার পর শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ভগবদ্গীতা অথবা শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী পূর্ববর্ণিত গুণাবলী সমন্বিত ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখ থেকে শ্রবণ করতে হবে। তা হলে নিঃসন্দেহে সব কিছু সাফল্যমণ্ডিত হবে।

শ্লোক ৩৭

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় ধীমহি।
প্রদ্যুম্নায়ানিরুদ্ধায় নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ ॥ ৩৭ ॥

ওঁ-ভগবানের অপ্রাকৃত মহিমা-সমন্বিত প্রণব মন্ত্র; **নমঃ**-ভগবানকে প্রণতি নিবেদন; **ভগবতে**-পরমেশ্বর ভগবানকে; **তুভ্যম**-আপনাকে; **বাসুদেবায়**- বসুদেবনন্দন ভগবান বাসুদেবকে; **ধীমহি**-কীর্তন করি; **প্রদ্যুম্নায়**, **অনিরুদ্ধায়**, **সঙ্কর্ষণায়**-ভগবান বাসুদেবের সমস্ত অংশ-প্রকাশ-কে; **নমঃ**-সশ্রদ্ধ প্রণাম; **চ**-এবং।

অনুবাদ

প্রণবস্বরূপ হে শ্রীকৃষ্ণ, আপনি বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্নও অনিরুদ্ধ এই চতুর্ব্যূহাত্মক; আপনাকে মনের দ্বারা নমস্কার ও ধ্যান করি।

তাৎপর্য

'পঞ্চরাত্র' অনুসারে নারায়ণ হচ্ছে ভগবানের সমস্ত প্রকাশের আদি কারণ। এই সমস্ত প্রকাশ হচ্ছেন বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ। বাসুদেব এবং সঙ্কর্ষণ মাঝখানের বাঁ দিকে এবং ডান দিকে, প্রদ্যুম্ন সঙ্কর্ষণের ডান দিকে এবং অনিরুদ্ধ বাসুদেবের বাঁ দিকে -এইভাবে চারটি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এদের বলা হয় শ্রীকৃষ্ণের এটি হচ্ছে একটি বৈদিক মন্ত্র, যা শুরু হয়েছে ওঁ-কার প্রণব দিয়ে এবং 'ওঁ নমো ধীমহি' ইত্যাদি বীজ মন্ত্র সমান্বিত চতুর্ব্যূহের এই মন্ত্রকে বৈদিক মন্ত্র বলেই স্বীকার করা হয়েছে।

যে কোন কর্ম, তা সকাম কর্মের স্তরেই অধিষ্ঠিত হোক অথবা মনোধর্মপ্রসূত দর্শনের স্তরেই হোক, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত তত্ত্বউপলব্ধির উদ্দেশ্যে সাধিত না হয়, তা হলে সম্পূর্ণ অর্থহীন বলেই বিবেচনা করা হয়। তাই নারদ মুনি ভগবদ্ভক্তির ক্রমবিকাশের ফলে ভগবানের সঙ্গে জীবের আন্তরিক সম্পর্ক যে কিভাবে গভীর থেকে গভীরতর হয় তা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বর্ণনা করে অনন্য ভক্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেছেন। ভগবানের প্রতি এই অপ্রাকৃত ভক্তির পরম প্রাপ্তি হচ্ছে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা। এই

প্রেম বিভিন্ন অপ্রাকৃত রসের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই ভগবৎ-সেবা মিশ্রভাবেও সম্পাদিত হয়, সকাম কর্মমিশ্রা ভক্তি অথবা মনোধর্ম প্রসূত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি।

শৌনক আদি ঋষিরা সদ্গুরুর সেবায় সূত গোস্বামী সফল্যের গুঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করেছিলেন তা এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে—তেত্রিশ অক্ষর সমন্বিত এই মন্ত্র উচ্চারণের ফলে তার হৃদয়ে দিব্য জ্ঞান প্রকাশিত হয়েছিল। এটি চতুর্ব্যূহের মন্ত্র। কেন্দ্রে রয়েছেন শ্রীকৃষ্ণ। কেন না চতুর্ব্যূহ হচ্ছেন তাঁরই প্রকাশ। তাঁর নির্দেশের সব চাইতে গোপনীয় অর্থ হচ্ছে সর্বদাই বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধরূপে প্রকাশিত ভগবানের অংশপ্রকাশ সহ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন ও স্মরণ করা উচিত। এই চতুর্ব্যূহ হচ্ছেন বিষ্ণুতত্ত্ব অথবা শক্তিতত্ত্বরূপ অন্য সমস্ত সত্যের আদি উৎস।

শ্লোক ৩৮

ইতি মূর্ত্যভিধানেন মন্ত্রমূর্তিমমূর্তিকম্॥
যজতে যজ্ঞপুরুষং স সম্যগ্দর্শনঃ পুমান্ ॥ ৩৮

ইতি-এইভাবে; **মূর্তি**-প্রতিরূপ; **অভিধানেন**-শব্দের দ্বারা; **মন্ত্রমূর্তিম্**-মন্ত্রমূর্তি; **অমূর্তিকম্**-পরমেশ্বর ভগবান, যাঁর কোন জড় রূপ নেই; **যজতে**- আরাধনা করা; **যজ্ঞপুরুষম্**-পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **সঃ**-তিনিই কেবল; **সম্যক্ দর্শনঃ**-সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানবান; **পুমান্**-পুরুষ।

অনুবাদ

এইভাবে যিনি বাসুদেব আদি চার মূর্তির নামাত্মক মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রোক্ত চিন্ময়রূপী অথবা প্রাকৃত মূর্তিরহিত যজ্ঞেশ্বরকে পূজা করেন, তিনিই হচ্ছেন প্রকৃত জ্ঞানবান।

তাৎপর্য

আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়গুলি জড় উপাদান দ্বারা গঠিত এবং তাই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অপ্রাকৃত রূপ দর্শনে তা অসমর্থ। তাই তিনি মন্ত্রের দ্বারা মন্ত্রমূর্তিতে পূজিত হন। যা কিছুই আমাদের ভ্রান্ত ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতার অতীত তা কেবল শব্দের মাধ্যমে জানা যেতে পারে। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে বহু দূর থেকেও কিভাবে শব্দের মাধ্যমে বস্তু বা ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায়। জড়ের মাধ্যমে যদি তা সম্ভব হয়, তাহলে চিন্ময় স্তরে তা সম্ভব হবে না কেন? এটি কোন অস্পষ্ট নির্বিশেষ অভিজ্ঞতা নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় পরমেশ্বর ভগবানের বাস্তব অভিজ্ঞতা যাঁর রূপ বিশুদ্ধ সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়।

সংস্কৃত অভিধান অমরকোষে 'মূর্তি' শব্দটির দুটি অর্থ দেওয়া হয়েছে, প্রতিরূপ এবং বিঘ্ন। আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তার ভাষ্যে 'অমূর্তিকম্' শব্দটি 'নির্বিঘ্নে'। বলে বিশ্লেষণ করেছেন । আমাদের চিন্ময় স্বরূপে চিন্ময় ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই ভগবানের সচ্চিদানন্দময় অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা যায়; অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ উচচারণ করার ফলে আমাদের চিন্ময় স্বরূপের পুনঃপ্রকাশ হয়। এই মন্ত্র ভগবানের আদর্শ প্রতিনিধি সদ্গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয় এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে মন্ত্র জপ করার অনুশীলন করতে হয়। তার ফলে আমরা ধীরে ধীরে ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারি। পাঞ্চরাত্রিক প্রথায় অর্চনের পন্থা নির্দেশিত হয়েছে, যা হচ্ছে প্রামাণিক এবং স্বীকৃত। পাঞ্চরাত্রিক প্রথাই হচ্ছে অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবার সব চাইতে প্রামাণিক পক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সাহায্য ব্যতীত কেউই ভগবানের নিকটবর্তী হতে পারে না, আর শুষ্ক জ্ঞানের জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে তো নয়ই। পাঞ্চরাত্রিক প্রথা এই কলিযুগের জন্য যথার্থই উপযুক্ত। কলিযুগের জন্য বেদান্ত থেকেও পাঞ্চরাত্রিক প্রক্রিয়া অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

শ্লোক ৩৯

ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্যং স্বস্মিন্ ভাবংচ কেশবঃ ॥ ৩৯ ॥

ইমম্-এইভাবে; **স্বনিগমম্**-বেদে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় গুহ্য জ্ঞান; **ব্রহ্মন্**-হে ব্রাহ্মণ (ব্যাসদেব); **অবেত্য**-ভালভাবে জেনে; **মৎ**-আমার দ্বারা; **অনুষ্ঠিতম্**-অনুষ্ঠিত হয়েছে; **অদাৎ**-দেওয়া হয়েছে; **মে**-আমাকে **জ্ঞানম্**-দিব্য জ্ঞান; **ঐশ্বর্যম্**-ঐশ্বর্য; **স্বস্মিন্**-ব্যক্তিগত; **ভাবম্**-অন্তরঙ্গ স্নেহ এবং প্রীতি; **চ**-এবং; **কেশবঃ**- শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদগুহ্য জ্ঞান দান করেন এবং তারপর অণিমা আদি দিব্য ঐশ্বর্য দান করেন এবং সেগুলির প্রতি আমার অনাসক্তি দর্শন করে তিনি আমাকে প্রেম প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ ভগবানের যে প্রকাশ তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। এটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সান্নিধ্যে আসার সর্বোত্তম পন্থা। দশটি নাম-অপরাধ বর্জন করে, ভগবানের সঙ্গে এইভাবে বিশুদ্ধ সংযোগ স্থাপনের ফলে ভক্ত জড় জগতের স্তর অতিক্রম করে শুদ্ধ সত্ত্বে অধিষ্ঠিত হতে পারেন এবং বৈদিক শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন- অপ্রাকৃত জগতে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবহিত হতে পারেন। যাঁরা ভগবান এবং শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক-শ্রদ্ধাসম্পন্ন, ভগবান তাঁদের কাছে ধীরে ধীরে তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করেন। তারপর ভক্ত আটটি যৌগিক সিদ্ধিলাভ করেন এবং চরমে ভক্ত ভগবানের স্বপার্ষত্ব লাভ করেন এবং গুরুদেবের মাধ্যমে ভগবানের বিশেষ সেবা লাভ করেন। শুদ্ধ ভক্ত যোগসিদ্ধি প্রদর্শন করার চাইতে ভগবানের সেবা করার প্রতি অধিক আগ্রহী। শ্রীনারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এই সমস্ত তথ্য বিশ্লেষণ করেছেন এবং নারদ মুনি যা লাভ করেছিলেন, তা ভগবানের শব্দরূপ প্রকাশের শুদ্ধ উচ্চারণের মাধ্যমে লাভ করা যেতে পারে। এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ গ্রহণে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, যদি তা গুরু-পরম্পরার ধারায় নারদ মুনির মতো প্রতিনিধির কাছ থেকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্লোক ৪০

ত্বমপ্যদভ্রশ্রুত বিশ্রুতং বিভোঃ
সমাপ্যতে যেন বিদাং বুভুৎসিতম্।
প্রাখ্যাহি দুঃখৈর্মুহুর্দিতাত্মনাং
সংক্লেশনির্বাণমুশন্তি নান্যথা ॥ ৪০ ॥

ত্বম-তুমি; **অপি** -ও; **অদভ্র**-বিশাল; **শ্রুত**-বৈদিক শাস্ত্র; **বিশ্রুতম**-শ্রবণ করা হয়েছে; **বিভোঃ**-সর্বশক্তিমানের; **সমাপ্যতে**-তুষ্ট; **যেন**-যার দ্বারা; **বিদাম্**-বিদ্বানের; **বুভুৎসিতম্**-যিনি সর্বদাই অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষী; **প্রাখ্যাহি**-বর্ণনা কর; **দুঃখৈঃ**-দুঃখের দ্বারা; **মুহুঃ**-সর্বদা; **অর্দিত-আত্মনাম**- দুঃখ -দুর্দশাগ্রস্ত মানুষেরা; **সংক্লেশ**-দুঃখ-দুর্দশা; **নির্বাণম্**-নিবৃত্তি; **উশন্তি ন**- বের হয় না; **অন্যথা**-অন্য কোন উপায়ে।

অনুবাদ

তাই দয়া করে তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা কর, যা তুমি তোমার বিশাল বৈদিক জ্ঞান থেকে জানতে পেরেছ। কেন না, তা জানলে মহান বিদ্বানদের সব কিছু জানা হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা যারা নিরন্তর জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করছে, তাদের দুঃখদুর্দশার সমাপ্তি হয়। এ ছাড়া দুঃখ নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই।

তাৎপর্য

শ্রীনারদ মুনি তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্টভাবেই বর্ণনা করেছেন যে জড় জগতের সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ব্যাপকভাবে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা প্রচার করা। চার রকমের ভাল মানুষেরা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করে এবং এই ধরনের ভাল মানুষেরা-১) যখন আর্ত হয়, ২) যখন অর্থার্থী হয়, ৩) যখন তত্ত্বজ্ঞানের জিজ্ঞাসু হয় এবং ৪) যখন তারা বেশি করে ভগবানের কথা জানতে চায়, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হয়। নারদ মুনি ব্যাসদেবকে উপদেশ দিলেন বিশাল বৈদিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রাকৃত ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচার করতে যা তিনি ইতিমধ্যেই লাভ করেছেন। চার রকমের খারাপ মানুষ রয়েছেঃ ১) যারা সকাম কর্মের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তার ফলে তারা দুঃখ ভোগ করে, এদের বলা হয় মূঢ়, ২) যারা তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য নানা রকম জঘন্য কর্মের প্রতি আসক্ত এবং তার ফলে তারা তার ফল ভোগ করে এদের বলা হয় নরাধম, ৩) যারা জড় বিদ্যায় মস্ত বড় পণ্ডিত, কিন্তু তারা নানা রকম দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, কেন না তারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করতে চায় না, এদের বলা হয় মায়া-অপহৃত-জ্ঞান এবং ৪) যারা হচ্ছে নাস্তিক এবং তাই তারা নিরন্তর নানা রকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করলেও ভগবানের নাম পর্যন্ত শুনতে চায় না, এই ধরনের ভগবদ্বিদ্বেষীদের বলা হয় আসুরী।

শ্রীনারদ মুনি ব্যাসদেবকে ভগবানের মহিমা প্রচার করতে উপদেশ দিলেন, যাতে ভাল এবং খারাপ এই উভয় স্তরের আট রকমের মানুষের মঙ্গল সাধিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবত তাই কোন বিশেষ ধরনের মানুষ বা বিশেষ জাতির জন্য নয়। তা হচ্ছে ঐকান্তিক জীবদের জন্য, যাঁরা তাঁদের যথার্থ মঙ্গল সাধন করে প্রকৃত শান্তি লাভ করতে চান।

ইতি-"ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য। (চলবে)

'ধার্মিক হতে চাইলেও দেহ তমোগুণাচ্ছন্ন হয়'- ১২ পৃষ্ঠার পর

ইচ্ছা অভিলাস কামনা বাসনা তো থাকবেই, কিন্তু সভ্য মানব-সমাজের মানদণ্ড হল এই যে, সেইগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত সংযত রাখা চাই। কারণ অসংযত স্বভাবের ফলে দেহ এবং মন কলুষিত ও ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, এবং তার কর্মফলও হয় দুর্বিষহ। সেই ফলভোগে ব্যক্তিবিশেষ যেমন কষ্ট পায়, তেমনি তার সমাজেও অনুরূপ দুর্ভোগের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া নানাভাবে দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এমন একটি সুন্দর অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক অনুশাসন রূপক কাহিনীর আকারে বিধৃত হয়ে রয়েছে। দুঃখের বিষয়, মানুষ ভাগবত পড়ে না, এবং পড়ে বোঝবার চেষ্টাও করে না।

সংযম অভ্যাসের মূল পন্থা হল অনাসক্তি এবং নির্লোভিতা। মন সর্বদাই ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির দিকে ছোটে, সেটাই যতকিছু সঙ্কটের মূল কারণ। মনের সেই দুর্দমনীয় বেগবতী প্রবণতাকে সংযত করতে হলে আসক্তি দমন করা অত্যাবশ্যক। অবশ্য বড় বড় যোগী ঋষিরাও সেই বিষয়ে বহু ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। কিন্তু তা বলে সাধারণ মানুষ যে সংযমের চর্চা বর্জন করে বল্গাবিহীন ভোগতৃপ্তির দিকে মনকে ছুটিয়ে দেবে তার সমর্থনে কোনও যুক্তি খাটে না।

'পুন্যনামের বন্যায় ভাসবে সবাই'- ০৭ পৃষ্ঠার পর

হরিনামই হচ্ছে এই যুগের গতি। তাই আমি সকলের সাথে সংকীর্তন আন্দোলন করি। আর হরিনাম করতে করতে আমি পাগলের মতো হয়ে যাই, কথা আটকিয়ে যায় কখনও হাসি, কখনও জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। এই অবস্থায় আমি গুরুদেবের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছি, আপনি কি মন্ত্র আমাকে দিয়েছেন-আমার মাথা ঘুরে যায়। এই হরিনাম করতে কি আমি ভুল করছি?

গুরুদেব বলেছেন, ভুল করবে কেন? এ সব তো হচ্ছে প্রেমের লক্ষণ। তোমার মধ্যে ভক্তি আছে বলে নাম করতে করতে তোমার মধ্যে এই ভাবগুলি প্রকাশিত হচ্ছে।

মহাপ্রভু বললেন, তাই আমি হরিনাম করছি। বলুন, এতে কোনও দোষ আছে?

তখন তারা বলল, হরিনাম তো ভাল, কিন্তু বেদান্তসূত্র তো পাঠ করতে হবে সন্ন্যাসীদের। এই সুযোগ যখন মহাপ্রভু পেয়েছেন তখন আবার বিনয় প্রদর্শন করে তাদের অনুমতি চেয়ে নিলেন কিছু বলার জন্য এবং মহাভারত থেকে ব্যাখ্যা করে এমন সুন্দর বেদান্তসূত্র পাঠ করলেন যে, সমস্ত বেদান্তিক সন্ন্যাসীরা মহাপ্রভুর শরণাপন্ন হয়ে পড়ল।

এইভাবে মহাপ্রভু সমস্ত জগৎকে ভগবৎ-প্রেমে প্লাবিত করেছেন।

বৈদিক শাস্ত্রের আলোকে জন্মান্তরবাদ

শ্রীমায়াপুর-চন্দোদয় মন্দিরকক্ষে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা প্রবচন

-শ্রীমদ সুভগ্ স্বামী মহারাজ

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ একদিন ভারতের কোন এক রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর তিনি পাননি।

তখন শ্রীল প্রভুপাদ তাকে ভগবদ্গীতার কথা বলেছিলেন এবং সেই প্রসঙ্গে শিক্ষার উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তা বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পাঁচ হাজার বছর আগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আত্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে অর্জুনকে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, 'দেহ' এবং 'দেহী' এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য এবং সম্পর্ক উপলব্ধির শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষাব্যবস্থা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

গীতায় বলা হয়েছে-

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারাং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র না মুহ্যতি। (২/১৩)

'দেহ' ও 'দেহী'-দুটি কথা আছে এখানে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা এই দেহকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। কিন্তু স্বরূপত আমরা কি এই দেহ? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা থেকে আমরা জানতে পারছি যে, আমরা দেহ নই; দেহের ভেতর যে আছে, সে-ই হচ্ছে আমি; আমি হচ্ছি দেহী। দেহস্থিত সচেতন সত্তা।

মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর প্রথমে আমার একটি শিশুর দেহ ছিল। সেই দেহটি এখন নেই, তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তারপর আমার বালকের দেহ ছিল; তারপর আমি এক কিশোরের দেহ পেয়েছিলাম; সেই দেহটিরও বিনাশ হয়েছে। কিন্তু তখনও আমি ছিলাম, তারপর আমি যুবক-দেহ পেলাম।

বর্তমান যুগের চিকিৎসা-বিজ্ঞানও স্বীকার করে নিয়েছে যে, প্রতি মুহূর্তে আমাদের দেহের কোষগুলি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে এবং আমরা নতুন দেহ পাচ্ছি। প্রতি সাত বছর পর, আমাদের দেহের আমূল পরিবর্তন ঘটছে; তখন আমি এক সম্পূর্ণ নতুন দেহ লাভ করছি। কানাডায় 'মন্ট্রিয়েল গেজেট' নামে একটি পত্রিকায় 'আত্মা সম্পর্কে হৃদরোগ বিশেষজ্ঞের জিজ্ঞাসা' এই শিরোনামায় একটি সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল কিছুদিন আগে। এই নিবন্ধে বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার উইলফ্রেড জি বিগোলো সুশৃঙ্খলভাবে আত্মার স্বরূপ ও তার উৎস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য অনুরোধ করেছেন বিজ্ঞানীদের কাছে।

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ তাকে এই

বিষয়ে একখানি চিঠি লেখেন এবং আত্মতত্ত্ব সম্পর্কে বৈদিক শাস্ত্রের অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়েছিলেন। কার্যকর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এই চিৎকণ আত্মাকে জানা যায়। এই চেতন কণাটি আমাদের দেহকে জীবন দান করে, এবং বস্তুত এই চিৎকণের অস্তিত্বের জন্যই আবার আমরা অন্য দেহে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারি। এই সব তথ্য তিনি বিশ্লেষণ করেছেন তার ঐ চিঠিতে। ডঃ বিগোলো টরেন্টো ছিলেন জেনারেল হাসপাতালের হৃদরোগের শল্য চিকিৎসা বিভাগের প্রধান। তিনি তার বহু অভিজ্ঞতা থেকে জানাচ্ছেন যে, কোন কোন ক্ষেত্রে রোগী এক জীবন্ত অবস্থা থেকে প্রাণহীন, নির্জীব অবস্থায় যাওয়ার সময়ে রোগীর মধ্যে এক রহস্যময় পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। সেই দৃশ্যটির বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ দেওয়া খুব কঠিন। সব চেয়ে লক্ষ্যণীয় এই যে, ঐ অবস্থায় রোগীর চোখে ঔজ্জ্বল্যের অভাব দেখা যায়। তার চোখের মধ্যে এক প্রাণহীনতার ভাব ফুটে ওঠে। এই সমস্ত লক্ষণ বিচার করে, দীর্ঘ ৩০ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যে, 'আত্মা' বলে কিছু একটা বিস্ময়কর সত্তা অবশ্যই জীবদেহের মধ্যে অবস্থান করে। বহুকাল থেকেই পৃথিবীর বহু বিখ্যাত দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিকরা এই সচেতন সত্তার বা আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে

তাদের বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ভবিষ্যৎ জীবনের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার দৃঢ় বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছেন। দেহের বিনাশের পর চেতন সত্তা, আত্মা বিরাজিত থাকে বলে, তারা দৃঢ় প্রত্যয় জানিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তার জীবনের একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। তখনকার দিনে গ্রীসদেশে তার দার্শনিক মতবাদ জনমানসে, বিশেষত যুবসমাজে, বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। প্রাচীনপন্থী সমাজনেতাদের চক্রান্তে দেশের রাষ্ট্রশক্তি তাকে বন্দী করে রাখে। বন্দী অবস্থায় কারাগারের মধ্যে মৃত্যুবরণ করবার জন্য তাকে বিষপান করতে দেওয়া হয়েছিল।

বিষপান করবার আগে আত্মতত্ত্বে বিশ্বাসী সেই মহান্ দার্শনিক সক্রেটিস্ সেই সমস্ত মূঢ় মুর্খ বিষদাতাদের বলেছিলেন, 'আগে আমি কে' তাকে ধরবার চেষ্টা কর, কিন্তু ঐ মূর্খরা তার কথার গূঢ় অর্থ কিছুই বুঝতে পারেনি। তিনি তার নিজের আত্মার কথা বলছিলেন। তিনি তো দেহ নন, তিনি একটি চেতন সত্তা, একটি চিৎকণ জীবাত্মা-এই সব তত্ত্ব ঐ মুর্খ লোকগুলি জানত না। তাই দার্শনিক সক্রেটিস কে তারা বুঝতে না পেরে পাগল মনে করেছিল। কেবলমাত্র সক্রেটিসই নন, টলষ্টয়, হারমন হেসে, এমারসন আদি বিশ্বের অনেক দার্শনিক, কবি, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিকও আত্মা ও তার কার্যাবলীতে দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছেন।

আর বিশ্বের সব চেয়ে প্রাচীন জ্ঞানগর্ভ শাস্ত্রসম্ভার বৈদিক গ্রন্থাবলীতে বলা হয়েছে, অহম্ ব্রহ্মাস্মি-অর্থাৎ আমি জড় দেহ নই, আমি ব্রহ্ম, আমি এক চেতন সত্তা আত্মা। বিশ্বের অন্যান্য বহু শাস্ত্রেও আমাদের এই দেহস্থিত চেতন সত্তা অর্থাৎ আত্মার কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে বৈদিক শাস্ত্রে আত্মার অস্তিত্বের বিবরণ সব চেয়ে বিস্তৃতভাবে দেওয়া হয়েছে। স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতে আত্মতত্ত্ব চর্চা চলে আসছে, তাই ব্রহ্মসূত্র থেকে শুরু হয়েছে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। সেখানে বলা হয়েছে, 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা'। জড়জাগতিক বিচারে একজন পণ্ডিত হলেও, শ্রীসনাতন গোস্বামী যিনি তাঁর পূর্ব আশ্রমে বাংলার নবাবের মন্ত্রী ছিলেন- তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অকপটে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কে আমি?' এইটি যথার্থ বুদ্ধিমানের প্রশ্ন এবং এই প্রশ্ন থেকে যথার্থ আত্মজ্ঞান লাভের মাধ্যমে জীবনের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনের সম্ভাবনা জাগে। এই আত্মার বিষয়ে গীতায় (২/২৯) একে আশ্চর্যজনক বলে বর্ণনা করে বলা হয়েছে-

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্, আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

তেমনি, গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই আত্মা সম্পর্কে অর্জুনকে বুঝিয়েছেন, দেহী নিত্যমবধ্যোহয়ম্, অর্থাৎ এই দেহে বসবাসকারী যে দেহী, তা নিত্য বিরাজ করে এবং তা একেবারেই অবধ্য।

অন্যত্রও বৈদিক শাস্ত্রে আত্মার এই অবিনশ্বরতার কথা বলা হয়েছে। আত্মাকে পরম জ্ঞানময় এবং আনন্দপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

গীতায় এই দেহটিকে একটি যন্ত্র বলা হয়েছে। জীব এই যন্ত্রে আরোহণ করে (যন্ত্রারূঢ়াণি) বহুকাল যাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ৮৪ লক্ষ বিভিন্ন ধরণের জীবদেহ ধারণ করে ভ্রমণ করে চলেছে। ৯ লক্ষ জল যোনি, ১১ লক্ষ ক্রিমি যোনি, ১০ লক্ষ পক্ষী যোনি, ২০ লক্ষ বৃক্ষ যোনি, ৩০ লক্ষ পশু যোনি এবং ৪ লক্ষ মনুষ্য যোনি আছে। এই সমস্ত বিস্তারিত তথ্য বৈদিক শাস্ত্রসম্ভারে রয়েছে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের বিশদভাবে শেখানো উচিত। ভগবদ্‌গীতায় জীবকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ 'সর্বগত' বলেছেন; তাই সে ব্রহ্মলোক থেকে পাতাল লোক পর্যন্ত বিভিন্ন জীবদেহ লাভ করে জন্ম-মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে যুগ যুগ ধরে আবর্তিত হয়ে চলেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান ব্যাসদেব বলেছেন, লব্ধা সুদুর্লভং ইদং বহু সম্ভবন্তে-বহু বহু জন্মের পর জীব অত্যন্ত দুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম, মানবদেহ লাভ করে। মানবদেহ অনিশ্চিত (অধ্রুবম্) কিন্তু সেই সঙ্গে অর্থদম্॥ এই মানবদেহ ধারণের মাধ্যমেই জীবনের যথার্থ মূল্য উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। তাই এই দেহের মুল্য অপরিসীম। কেননা, এই জীবনেই মানুষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হতে পারে। উপযুক্ত সদ্‌গুরু তথা শুদ্ধ বৈষ্ণবের কাছ থেকে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে মানুষ পরমতত্ত্ব লাভ করতে পারে এবং ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে।

জীবজগতের বৈচিত্র্যের বিশেষ ব্যাখা আমরা একমাত্র বৈদিক শাস্ত্রে সুন্দরভাবে আছে, দেখতে পাই। কর্মণা দৈবনেত্রেণ জন্তর্দেহোপপদ্যাতে-প্রত্যেক মানুষের সকল কর্মই দেবতারা লক্ষ্য করে থাকেন। তারা মানুষের সকল কর্মের ফলাফল বিচার করেন এবং মানুষের কর্ম আর তার আসক্তি অনুসারে প্রকৃতি তাদের বিভিন্ন দেহ প্রদান করে। প্রকৃতি এমন একটি দেহ দেয়, যার দ্বারা মানুষ তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করতে পারে ও তার যথাযথ কর্মফলও ভোগ করবার সুযোগ লাভ করে। মনুষ্যতর জীবকূল নিম্নযোনি থেকে উত্তরোত্তর উচ্চযোনি লাভ করে থাকে। কারণ মানুষের মতো তাদের চেতনা উচ্চ স্তরের নয়, তাই তাদের কর্মফল নেই। এই সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের সু-ব্যবস্থা সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবশ্যই থাকা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে দেশের মানুষ কর্মফলের পরিণাম সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হতে আগ্রহী হবে না।

প্রভুপাদ পত্রাবলী

সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী বিরচিত অনুবাদক ঃ প্রাণেশ্বর চৈতন্য দাস (প্রণব)

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আমার প্রিয় কীর্তনানন্দ,

তুমি আমার আন্তরিক আর্শিবাদ নিও। আশা করি আমার প্রেরিত চিঠিপত্র এবং বক্তৃতাগুলি তুমি ইতিমধ্যে পেয়ে থাকবে। তবে ইতিপূর্বে আমি মন্ত্রিল এর জানিস এর একটি পত্র পেয়েছি উনি আমাকে মন্ত্রিলে একটি সুন্দর মন্দির স্থাপনের অনুরোধ জানিয়েছি। এবং সেখানে একটি সুন্দর জায়গায় এই ধরনের একটি কেন্দ্র স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করবেন। সে আমাকে নিউইর্য়ক থেকে দুজন ছবি এবং চারশত ডলার প্রয়োজন হবে বলে জানিয়েছে। তাই আমি তোমাকে অন্তত পক্ষে এক সপ্তাহের জন্য একবার সেখানে গিয়ে জায়গাটা দেখে বিবেচনা করবে যদি সেখানে একটি কেন্দ্র স্থাপন করা যায়। এই বিষয়ে আমার কাছে চারশত ডলার প্রার্থনা করেছে। আমার বিশ্বাস তুমি যদি বিষয়টা অনুমোদন কর তাহলে সান্‌ফ্রানসিস্‌কো এবং নিউইর্য়ক মন্দির থেকে দুইশত ডলার করে প্রদান করবে যা পরবর্তীতে মন্ত্রিল মন্দির অবশ্যই পরিশোধ করবে। আমার ইচ্ছা যে প্রত্যেকটা মন্দির তার স্বাধীন অস্থিত্ব ও সহযোগীতা বজায় রাখতে এবং প্রত্যেক মন্দিরের আচার্য। আমরা এই নীতির প্রতি আস্থা রেখে সারা পৃথিবী ব্যাপী মন্দির নির্মাণ করে যাব। রামকৃষ্ণ মিশন সারা পৃথিবী ব্যাপী এই নীতি বজায় রেখে অভূতপূর্ব সাফল্য পেয়েছে। রব ওখানে যেতে সদা প্রস্তুত তবে তোমাকে সাহায্য করার জন্যই সে যাবে তোমার সাথে। জুনার্দন দাস অধিকারীর ওরফে জানিস ডামবারজ ঠিকানা নীচে দেওয়া হল ৩১১, সেন্ট লুইস স্কয়ার এপার্টমেন্ট-২ মন্ত্রিয়েল, কুইবেক, কানাডা। তবে প্রধান বিষয়টা হচ্ছে-১৯৬৭ এর এপ্রিল মাসে সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এখানে সমবেত হবে, তবে আমাদের উদ্দেশ্য হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইংরেজী এবং ভাষায় ক্রোড়পত্র প্রকাশ করা। যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আমাদের সংস্থার সদস্য হতে আগ্রহ প্রকাশ করে। মিঃ জেনিস আমাদের অনুরোধ করেছে মার্চ ১৯৬৭ এর মধ্যে আমাদের কেন্দ্রটির অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে। এবং আমরা এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে আমরা নিউ-ইয়র্ক হাউজ উদ্বোধন করে সেখানে যাব। আমার ধারনা প্রস্তাবটি খুবই সুন্দর এবং আমাদের এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। আর এই কাজের জন্য আমি তোমাকে নির্বাচন করছি যাতে এ-বিষয়টা সফলতা পায়। আমি আশা করছি এই ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্ত পরবর্তী ডাকে জানতে পারবো। আর যদি তুমি তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নিতে পার তবে মন্ত্রিয়েল থেকে তুমি আমাকে চিঠি লিখতে পারবে। মিঃ নিল এখনও এখানে পৌঁছায়নি।

তোমাদের চির শুভাকাঙ্খী
এ.সি ভক্তিবেদান্ত।

(চলবে)

'কৃষ্ণভাবনামৃতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি' ৮ পৃষ্ঠার পর

সেটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নিত্য ধাম। এই সমস্ত বৈকুণ্ঠলোকে যার বাস করেন তাঁরা ষড়ৈশ্বর্য পূর্ণ-অর্থাৎ তাঁদের সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র শ্রী, সমগ্র যশ, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য পূর্ণরূপে বর্তমান-এবং প্রতিটি বৈকুণ্ঠলোকে শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণরূপে প্রকাশিত হ'য়ে বিরাজ করছেন। সে সম্বন্ধে জড় বৈজ্ঞানিকদের কোন ধারণাই নেই। জড় বৈজ্ঞানিকদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় রহস্যগুলি কোনদিনই প্রকাশিত হবে না। আমাদের নিঃসন্দেহে স্বীকার করতে হবে যে মানুষের উপলব্ধির ক্ষমতা অতি সীমিত-ইন্দ্রিয়, বুদ্ধিবৃত্তি এবং প্রযুক্তি বিদ্যার ভিতর সীমিত। কেউই পরম বৈজ্ঞানিক শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করতে পারে না। তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর মালিক এবং তিনিই সবকিছুর পরম ভোক্তা। কৃষ্ণ বলছেন,

"বীজ মাং সর্বভুতানাং, বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্
বুদ্ধির্বুদ্ধিতাম্ অস্মি, তেজম্ তেজস্বীন্যমঅহম্"

(ভগবদ-গীতা ৭/১০)

অর্থাৎ 'হে পার্থ, আমি-সর্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি এবং আমি তেজস্বীর তেজ। হে ধনঞ্জয়, আমার থেকে শ্রেষ্ঠ আর কেউ নেই। সূত্রে যেমন মণি গাঁথা থাকে, তেমনই সমস্ত বিশ্ব আমাতে ওতোপ্রোতভাবে অবস্থান করে।" মুর্খরাই কেবল পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব নিয়ে তর্ক করবে। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন,

'ন মাং দুস্কৃতিন মূঢ়া প্রপদ্যন্তে নরাধমা
মায়য়া অপহৃতা জ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতা।

অর্থাৎ মূঢ় দুস্কৃতকারীরা এবং নরাধমেরা, মায়া যাদের জ্ঞান অপহরণ ক'রে নিয়ে গেছে এবং যারা আসুরিক ভাবাপন্ন, তারা কখনই আমার শরণাগত হয় না।

তাই পরম বৈজ্ঞানিক পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্ব অস্বীকার না ক'রে আমাদের বৈজ্ঞানিক বন্ধুদের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির মর্ম উপলব্ধি ক'রে সর্বত্রই তাঁর অপূর্ব প্রকাশ দর্শন করা। কেউ হয়ত রেডিও টেলিভিশন, কম্প্যুটার, পেনিসিলিন ইত্যাদি আবিষ্কারের মিথ্যা দাবী করতে পারেন, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে এগুলো সবই প্রকৃতিতে বর্তমান ছিল, কেননা তাদের উপাদান এবং কারণ উভয় প্রকৃতিজাত। কেউ যদি দাবী করে যে কোনকিছু তার, তাহ'লে সে হচ্ছে একটা চোর। সে পরম পিতার সম্পত্তি চুরি করছে এবং সেটাকে তার নিজের সম্পত্তি বলে দাবী করছে। এখানে কোনকিছুই আমাদের নয়। সবকিছুই কৃষ্ণের। তাই শ্রীঈশোপষিদে বলা হয়েছে-

ঈশাবাস্যম্ ইদং সর্বং, যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন নত্বেন ভুঞ্জিথা, মা গৃধ কস্য সিদ্ধনম্॥

অর্থাৎ এই জগতের সবকিছুই ভগবানের সম্পত্তি। কিন্তু ভগবান সকলের জন্যই একটা বরাদ্দ নির্দ্ধারিত ক'রে দিয়েছেন এবং সেটা নিয়েই সে যেন সন্তুষ্ট থাকে এবং কখনই অপরের সম্পত্তিতে যেন লোভ না করে।

ছোটদের শ্রীল প্রভুপাদ

কোচিন বন্দরে জাহাজ প্রথম থামলে তিন খন্ডের ২০০-শ্রীমদ্ভাগবত জাহাজে তোলা হল। এই গ্রন্থগুলি পাশ্চাত্যে স্বামীজির অণুপ্রেরণার একমাত্র উৎস ও জীবন স্বরূপ।
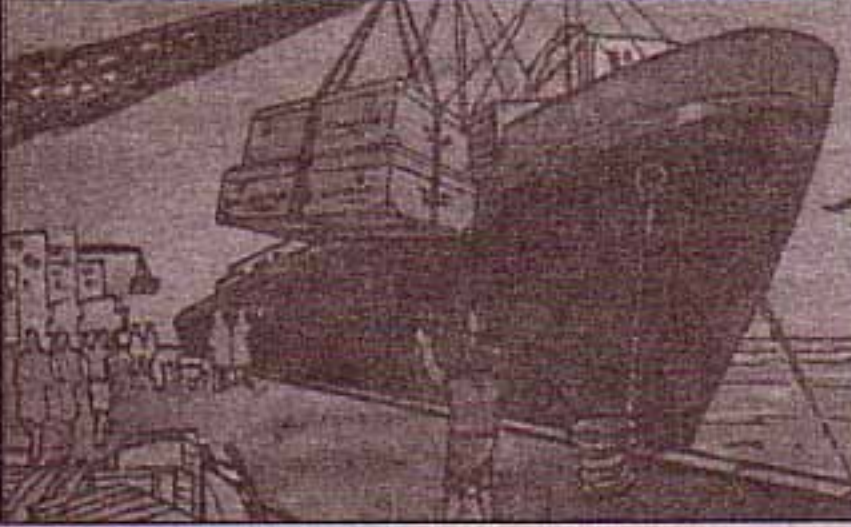
জাহাজে পড়ার জন্য তিনি একটি বাংলা চৈতন্যচরিতামৃতও সঙ্গে নিয়ে আসেন।

সমুদ্রের রূপ ছিল ভয়ঙ্কর ও উত্তাল। সামদ্রিক পীড়া ও বমিতে স্বামীজি কঠিন শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন। দুইদিনে তিনি ২বার হৃদরোগে আক্রান্ত হলেন।

স্বামীজি এই যাত্রার মূল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালেন। তিনি তাঁর গুরুদেবের ইচ্ছা পূর্ণ করতে চলেছেন। ৭০ বছর বয়সে পদার্পন উপলক্ষে তিনি জাহাজে-ই তাঁর জন্মদিন পালন করলেন। বৃদ্ধ হলেও তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

দ্বিতীয় দিন রাত্রে, জাহাজে তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দেখা দেন।

পরদিন সমুদ্র প্রশান্ত রূপ ধারণ করল। তিনিও বেশ সুস্থ হয়ে উঠলেন। জাহাজটি সাবলীল গতিতে চলছিল। এখন তিনি তাঁর গুরুদেবের অভিলাষ পূর্ণ করতে অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। এই সমুদ্রযাত্রা তাঁর ৬৫ বছরের প্রস্তুতির এক চরম সন্ধিক্ষণ। তিনি আজ তাঁর ব্রত সাধনে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছেন।

জলদূত বোষ্টন বন্দরে পৌছল ভোর বেলায় ; সেদিনটি ছিল ১৯৬৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর।
আ্যটল্যান্টিক মহাসাগর তার স্বাভাবিক মূর্তি ধারণ করলে,আমি হয়তো এ যাত্রায় মরেই যেতাম। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন জাহাজের প্রকৃত কর্ণধার।
A&P
জাহাজের ক্যাপটেন স্বামীজিকে তীরে নিয়ে গেলেন।
এ যে দেখছি নরক। হে কৃষ্ণ ! তুমি কৃপা করে এদের উদ্ধার কর। আমি যাতে তাদের তোমার সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে পারি, এইজন্য তোমার কৃপা প্রার্থনা করছি।
দুই দিন পর ১৯ সেপ্টেম্বর জলদূত নিউইয়র্ক বন্দরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। বেশভূষায় অবিচল, অটল; তিনিই বোধহয় নিউইয়র্কে প্রথম বৈষ্ণব সন্ন্যাসী। তিনি সোজা পেন্‌সিলভেনিয়ার বার্টলারে যান। সেখানে তার বসবাসের আয়োজনকারী শ্রীগোপাল আগ্রওয়াল তাকে অভ্যর্থনা করে স্বগৃহে নিয়ে যান।
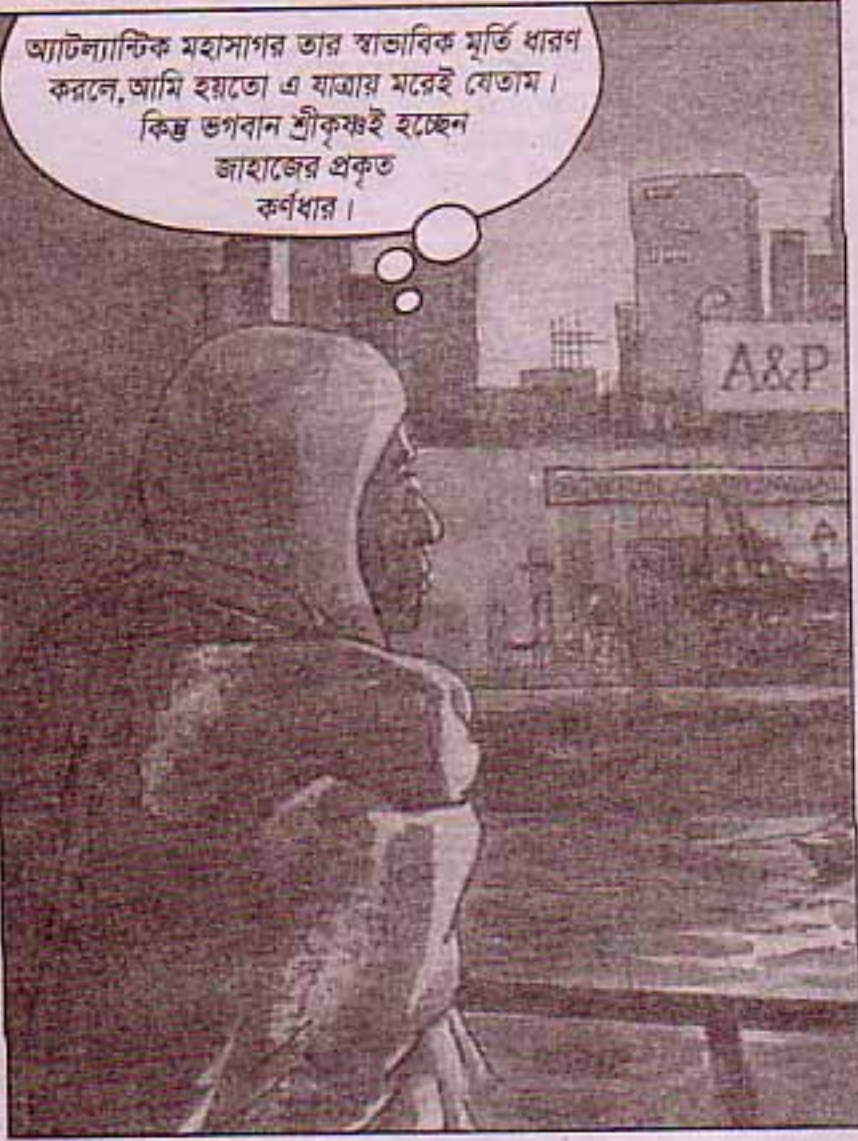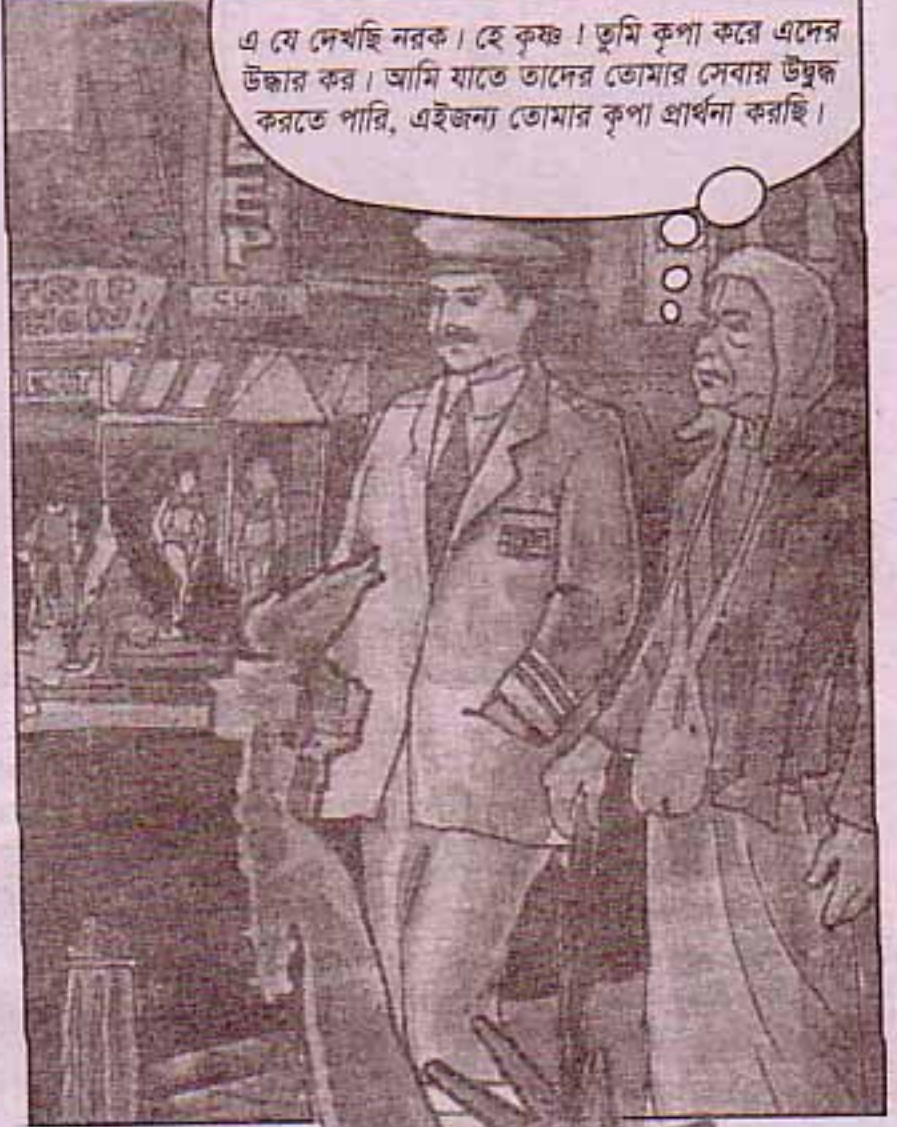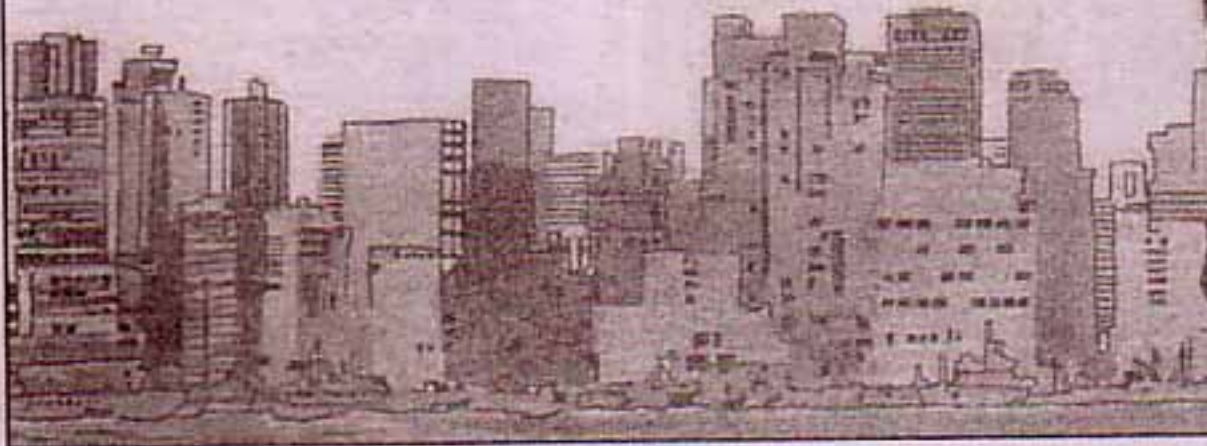
তিনি গোপালের আমেরিকান পত্নী-স্যালীকে ঠাকুরের ভোগ ও কিছু সুস্বাদু ভারতীয় খাবার রান্না করতে শিখালেন।

বাটলারে কে, স্বামীজির সঙ্গে কোন লোকের আবাসে সাক্ষাৎ করতে চাইবে?

স্যালি LION'S CLUB এ স্বামীজির ভাষণের ব্যবস্থা করলেন।...

আর বাটলারে Y M C A তেও
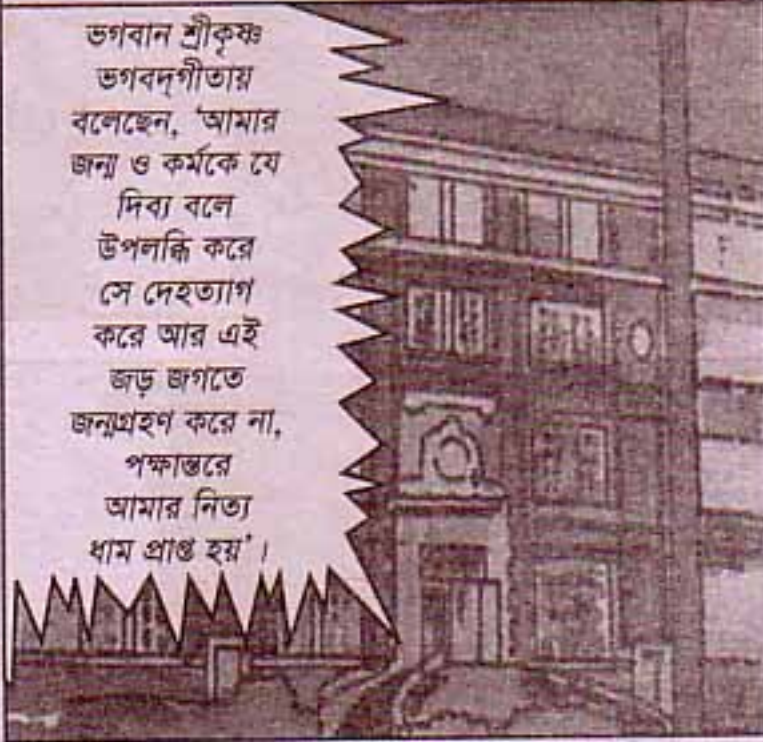
১৯৬৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ভোরবেলার খবরের কাগজ 'বাটলার ঈগল'-এ তাঁর একটি ছবি প্রকাশিত হয়। ঐ কাগজে তাঁকে সম্বোধন করে....
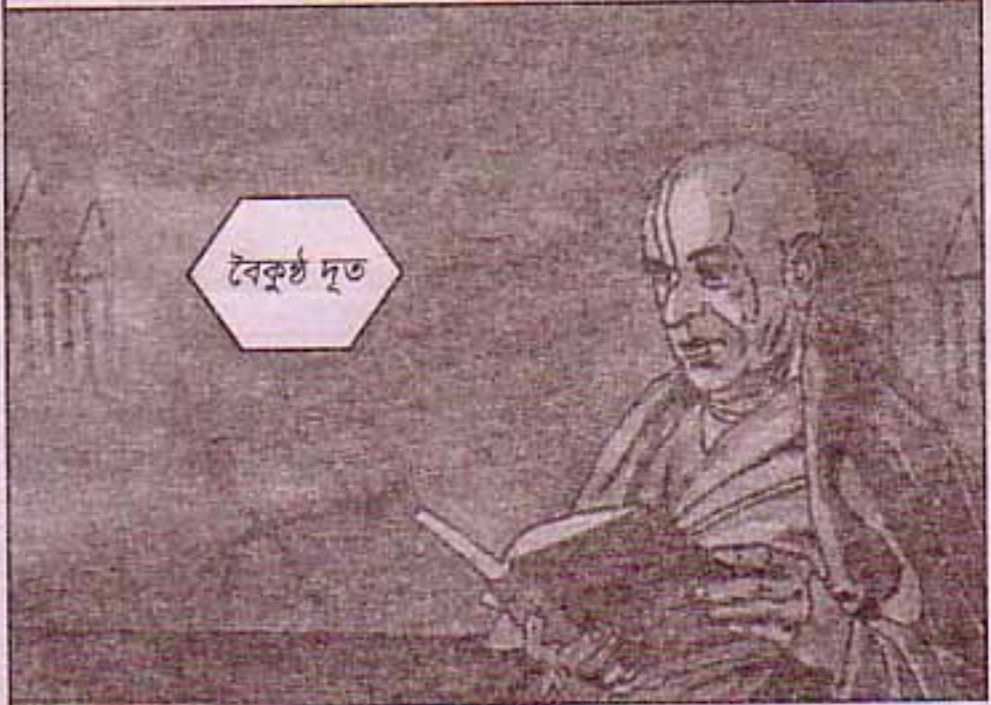
দু' মাস পর তিনি নিউইয়র্কে যান ও এক শহরবাসী ডক্টর রামমূর্তি মিশ্রর সহায়তায় এক সম্ভ্রান্ত এলাকার বাড়ীতে একটি ঘর সংগ্রহ করেন।
তিনি হরিনাম কীর্তন ও ভগবদ্‌গীতা পাঠ শুরু করলেন। ডক্টর মিশ্রর ক্লিনিকের কিছু লোকও নিয়মিতভাবে তাঁর কীর্তন ও পাঠে যোগদান করত।

একদিন তাঁর ঘরে চুরি হয়: তাঁর টাইপরাইটার ও টেপরেকর্ডার দু'টি চুরি যাওয়ায় স্বামীজি অন্যস্থানে যেতে মনস্থ করেন।

তাঁর সঙ্গে নিয়মিত যারা সাক্ষাৎ করতো, তাদের মধ্যে দু'জন-হারভে ও বিল, বাওয়ারি অঞ্চলে একটি বাড়ীর ছাদের উপরের ঘরে ডেভিড আ্যালেনের সঙ্গে থাকতে পরামর্শ দিল।

স্বামীজি ডেভিডকে তাঁর প্রথম আমেরিকান শিষ্য করবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু তা হবার নয়। মাদকতার নেশায় তাকে পেয়ে বসল, সে উন্মত্ত হয়ে উঠল। স্বামীজি সেই স্থানও পরিত্যাগ করলেন।

সুদূর বিদেশে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা। সৌভাগ্যক্রমে তাঁর নিয়মিত সাক্ষাৎকারীদের মধ্যে তিনি কার্ল ইয়ারজিন-কে পেয়েছিলেন।

কার্ল ও মাইকের সহায়তায় স্বামীজি লোয়ার ইষ্ট সাইড-এ একটি দোকানের সামনের ঘরটি ভাড়া নেন ও ঘরটিকে পরে একটি সভাগৃহে পরিণত করেন। তাঁর উপরের ঘরে স্বামীজি থাকতেন।

নিয়মিত ভগবদগীতা সম্পর্কে ভাষণের বিষয় জানিয়ে দোকান ঘরটার সামনে তিনি একটি সাইনবোর্ড বসান, ধীরে ধীরে জনসাধারণ নিয়মিতভাবে আসতে লাগল। তিনি কীর্তন শুরু করলেন। প্রতিদিন ভগবদ্গীতা পাঠ করে তিনি জনসাধারণের কাছে কৃষ্ণভাবনাময় তত্ত্বদর্শন বিশ্লেষণ করতেন।

তিনি তাঁর শ্রোতাদের হরিনাম মহামন্ত্র কীর্তন শিক্ষা দিলেন।

আপনাদের প্রশ্ন আমাদের উত্তর

প্রশ্ন ঃ (ক) দেহ এবং আত্মা সম্বন্ধে আমাদের সনাতন ধর্মে কি বলা হয়েছে, তা জানতে চাই? দেহ ও আত্মার পার্থক্য জানাবেন?

(খ) শাস্ত্রে নাকি ছয় প্রকার শত্রু হত্যার নির্দেশ আছে। জানতে চাই এই ছয় প্রকার শত্রু কারা?

প্রশ্নকর্তা-শিউলী রায়, বান্দেরকুড়া, লালমনিরহাট।

উত্তর ঃ (ক) দেহ এবং আত্মা দুটি পৃথক বস্তু। একটি স্থুল। আর একটি সুক্ষ্ম। একটি নশ্বর। অন্যটি অবনিশ্বর। অর্থাৎ দেহ ক্ষণ ভঙ্গুর। আত্মা অভঙ্গুর। দেহ মাটি, জল, আগুন, বাতাস এবং আকাশ দ্বারা তৈরী। আত্মা এরূপ উপাদানে তৈরী সামগ্রী নয়। আত্মা ঐশী শক্তি। চিন্ময় বস্তু। ভগবদ অংশ। কৃষ্ণাংশ। মমৈবাংশো। গীতা-১৫/৭ ॥ তাই দেহ বিনাশেও আত্মা নিত্য বর্তমান। দেহ কৌমার, যৌবন এবং জরাগ্রস্ত হয়। দেহ পরিবর্তনশীল। আত্মা অপরিবর্তনীয়। দেহ বিকাশের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন। কিন্তু আত্মার খোরাক কৃষ্ণভাবনার অমৃত। আত্মা কোন জড় খাদ্যশস্য গ্রহন করেন না।

আত্মার জন্ম নাই। মৃত্যু নাই। বৃদ্ধি নাই। বিনাশ নাই। আত্মা নিত্য নবীন। সত্য। সনাতন। দেহের জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধি, বিনাশ সবই হয়। দেহ অনিত্য। বেদ এবং গীতা শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনাই পাওয়া যায়। কঠ-১/২/১৮, ২০ এবং গীতা -২/২০, ২১ ॥ আত্মা বিষয়ে আরও বলা হয়েছে আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়া যায় না, ভেজানো যায় না। আত্মা অচ্ছেদ্য। অদাহ্য। অক্লেদ্য। এবং অশোধ্য। গীতা-২/২৩, ২৪ ॥ কিন্তু জড় শরীর এসবের বিপরীত। জড় শরীর বা দেহ স্থুলাকার। আর আত্মার আয়তন অতি সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর। সুক্ষ্মতম। শ্বেতা-৫/৯, মুন্ডক-৩/১/৯, গীতা-২/১৮ এবং ভাগবতের 'কেশাগ্রশতভাগস্য শতাংশঃ' শ্লোকে আত্মার আয়তন বিশ্লেষিত হয়েছে।

উত্তর ঃ (খ) ভগবদ্গীতার ২/৩৬ শ্লোকের ভাষ্যকালে শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন-'বেদের অনুশাসন অনুযায়ী শত্রু ছয় প্রকার। (১) যে বিষ প্রয়োগ করে, (২) যে ঘরে আগুন লাগায়, (৩) যে মারাত্মক অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করে, (৪) যে ধন সম্পদ লুন্ঠন করে, (৫) যে অন্যায়ভাবে জমি দখল করে এবং (৬) যে বিবাহিত স্ত্রীকে হরণ করে।

এই ধরনের শত্রুদের অবিলম্বে হত্যা করার নির্দেশ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে এবং এদের হত্যা করলে কোন পাপ হয় না।

প্রশ্ন ঃ শাস্ত্রে বলা হয়েছে গোবিন্দ বিগ্রহের চক্ষুদান এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হয়। মানুষ হয়ে কি গোবিন্দ প্রাণ প্রতিষ্ঠা ও চক্ষুদান করা যায়? তবে চক্ষুদান ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেও গোবিন্দ দেখেন না বা কথা বলেন না কেন?

উত্তর ঃ শ্রী গোবিন্দ প্রাণহীন জড় এবং চক্ষুহীন অন্ধ নয়। শ্রী বিগ্রহের প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং চক্ষুদান করা শাস্ত্রীয় বিধান। প্রাণ প্রতিষ্ঠ বা চক্ষুদান করলেই শ্রীগোবিন্দ দেখেন বা কথা বলেন নয়তো তিনি কথা বলেন না দেখতে পান না এমন কথা শাস্ত্রে নাই। ভক্তরাও তা বিশ্বাস করেন না। লিখেছেন-প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা চক্ষুদান করেও গোবিন্দ দেখেন না বা কথা বলেন না কেন? উত্তরে বলতে চাই, শ্রী গোবিন্দ শ্রী গীতায় বলেছেন তিনি সবার সাথে কথা বলেন না। তবে সবাইকে সমানভাবে দেখেন। সমোহহং সর্বভূতেষু। গীঃ ৯/২৯ ॥ তিনি দেখেন সবাইকে। কিন্তু তাঁকে সবাই দেখতে পান না। কেননা তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত হন না। নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য। গীঃ ৭/২৫ ॥ বেদ অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, পুণ্যকর্ম, কঠোর তপস্যা দ্বারাও শ্রীগোবিন্দকে দেখা যায় না। তিনি দেখা দেন না। কেবল কৃষ্ণপদে প্রেমভক্তি লাভেচ্ছু পথিকেরাই তাঁকে দর্শন করতে পারেন। গীঃ ১১/৪৮, ৫৪ ॥ তাঁর সাথে মুখোমুখি হয়ে কথা বলতে পারেন। এবং তাঁ কথা শুনতে পারেন। এই সকল কথা প্রলাপ মনে হতে পারে। কিন্তু সব সত্য। বুঝিবে রসিক জন, না বুঝিবে মূঢ়। প্রমাণ-ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতি ব্রহ্মনৈবেদং সর্বমনুভবতি ॥ পাষন্ডী যারা তারা ভগবানের এই সকল দিব্যলীলা থেকে বঞ্চিত থাকেন।

প্রশ্ন ঃ (ক) দেবতাদের সাথে শ্রীকৃষ্ণের কি সম্পর্ক। এবং তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কি তা জানাবেন?

(খ) যদি জীবহত্যা পাপ হয় তবে সাধু-বৈষ্ণবরাও পাপী। কারণ তাঁরাও শাক সব্জি খায়। সেগুলোওতো জীব। উদ্ভিদেরওতো প্রাণ আছে। সমাধান জানাবেন?

প্রশ্নকর্তা-সাধন কৃষ্ণ দাস, লালমনিরহাট।

উত্তর ঃ (ক) শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। পরমেশ্বর। দেব-দেবীরা তাঁর আজ্ঞাবাহী। সেবক-সেবিকা। শ্রীকৃষ্ণের সাথে দেব-দেবীদের প্রভু ভৃত্য সম্পর্ক। শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন মনিব। প্রভু! মহাপ্রভু! স্বামীন্। দেব-দেবীরা তাঁর দাস-দাসী। কিংকর! কিংকরী। শ্রীকৃষ্ণ আদি। অনাদি। তত্ত্ববস্তু। দেব-দেবীদেরও আদিতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ। অহমাদির্হি দেবানাং। গীঃ ১০/২ ॥ তাই দেব-দেবীরা শ্রীকৃষ্ণকে তত্ত্বতভাবে জানেন না। জানতে পারেন না। দেব-দেবীরা মায়া দ্বারা বিমোহিত হন। শ্রীকৃষ্ণ মায়াধীশ। মায়ারও ঈশ্বর তিনি। মায়াও শ্রীকৃষ্ণের দাসী।

শ্রীকৃষ্ণ দেবদেব। মহাদেব। মহাদেবেরও মহাদেব। পরম দেবতা। আর সেই পরম দেবতা শ্রীকৃষ্ণের ভয়ে ভীত হয়ে দেব-দেবীরা ত্রাস্ত-সন্ত্রস্ত হয়ে আপন আপন দায়িত্ব পালন করে চলেন। পবনদেব প্রবাহিত হন। সূর্যদেব উদিত হন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব যথাক্রমে সৃজন, পালন এবং সংহার করেন। শ্রীকৃষ্ণ এসব কিছুই করেন না। তিনি স্বরাট। ইচ্ছাময়। কেবল তাঁর ইচ্ছা দ্বারাই সবকিছুই সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা পুরনের জন্য, তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য দেব-দেবীরা তাঁদের আধিকারীক কাল পর্যন্ত আপন আপন দায়িত্ব পালন করেন।

শ্রীকৃষ্ণ অনন্ত রূপময়। অনন্ত গুণময় এবং লীলাময়। দেব-দেবীদের মধ্যে যে ক্ষমতা-সামর্থ্য স্বল্প পরিমাণে বিদ্যমান।

তারা সকলে পাপীর রাজ্যে বাস করে পাপের বোঝা আর দুঃখ ভোগ বাড়ায়। 'গীতার গান'এর ভাষায়-

আর যেবা অন্ন পাক নিজ স্বার্থে করে।
পাপের বোঝা ক্রমে বাড়ে দুঃখ ভোগ তরে ॥

নিবেদন না করে যারা খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করে শাস্ত্র তাদের চোর ডাকাত বলে ঘোষনা করেছেন। স্তেন এব সঃ ॥ গীঃ ৩/১২ ॥ অর্থাৎ অনিবেদিত খাদ্যগ্রহণ একদিকে পাপ ভক্ষণ অন্যদিকে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন। পাপ ভক্ষণ আর চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে কেউ কি সুখী হতে পারে? তবু 'অমেধ্য ভোজন করে 'লীডার' প্রবীণ॥"

আর মৎস-মাংসতো হিন্দুমাত্রই ভোজন নিষিদ্ধ। সুতরাং তা নিবেদনের প্রশ্নই ওঠে না। অনেক পাষন্ড আবার ভগবদ্গীতার 'যৎ করোষি যৎ অশ্নাসি (গীঃ ৯/২৭)-এই শ্লোকের অপব্যাখ্যা করে বলেন যে, গীতার যেহেতু বলা হয়েছে- 'তুমি যা খাও, তা সমস্তই ভাগবানকে অর্পন করো।' সুতরাং মাছ-মাংসাদি খেলেও তা নিবেদন করা যায়-এমন উদ্ভিট সিদ্ধান্ত গীতার বক্তব্য নয়।

উত্তর ঃ (খ) কেবল ব্রাহ্মণ কেন এ প্রশ্নোত্তর দাতার জন্মস্থানের প্রায় লোকই খাওয়ার সময় মাটিকে জল ছিটা দিয়ে দুই-চারটি ভাত মাটিতে নিবেদন করে। কুড়িবছর আগে এর প্রচল অনেক বেশী ছিল। এখন তা অনেকটা হ্রাস পেয়েছে। নিজেরা খাওয়ার সময় নিবেদন করার কোনও প্রয়োজন নেই। নিবেদন আগেই করতে হয়। নিবেদিত প্রসাদ খাওয়ার সময়-কৃষ্ণগোবিন্দ নাম স্মরণ করে প্রসাদ গ্রহণ করলেই হবে। মহাপ্রসাদ গোবিন্দে----- ॥

আপনি নিজে খাবেন থালায় আর নিবেদন করবেন মাটিতে এটা হয় না। তাইতো এদেশের অধিকাংশ হিন্দু এখন মাটিয়া বুদ্ধির লোক। প্রভুপাদের ভাষায়-

মাটিয়া বুদ্ধির লোক দিনে দিনে বাড়ে।
পতি-পত্নীর সম্পর্ক সব এক কথায় ছাড়ে ॥
পিশাচ হইল লোক কলির প্রভাবে।
লোক-দুঃখী বৈষ্ণবের কৃপার অভাবে ॥

প্রশ্ন ঃ বাবা-মার মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ বাসরে অথবা তারপরে মাছ খাওয়ার প্রচলন আছে এটা কি ঠিক?

প্রশ্নকর্তা-পিতু সাহা (ত্রয়ী), রাজগঞ্জ, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ হিন্দুমাত্রই মৎস্য ভোজন নিষিদ্ধ হয়েছে। এবং সেটি বেদ-বেদান্ত গীতা-ভাগবতের সিদ্ধান্ত। তদুপরি শ্রাদ্ধবাসরে অথবা তারপরে মৃত্যু ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনদের পরিতৃপ্তির জন্য মৎস্য ভোজন করা জঘন্য-পাপ কর্ম। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে বলা হয়েছে 'ন দদ্যাদ আমিষং শ্রাদ্ধে'-অর্থাৎ 'শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানে কখনও মাছ-
মাংসাদি নিবেদন করবেন না।' ব্যবহার করবেন না। ভাঃ ৭/১৫/৭ ॥ কেননা পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে-

যো ন দদ্যাদ্ হরের্ভুক্তং
অশ্নান্তি পিতরস্তস্য
বিন্মুত্রং সততং দ্বিজাঃ ॥ পঃ পুঃ ॥"

'হে দ্বিজগণ, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্যে ভগবান শ্রীহরির মহাপ্রসাদ যে ব্যক্তি নিবেদন করে না তার পিতৃপুরুষেরা সর্বদা মলমূত্র ভোগ করে থাকে।'

প্রশ্নঃ-ভাগবতে রাধানাম না থাকা সত্ত্বেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কেন রাধাকৃষ্ণ ভজনের নির্দেশ দিলেন

প্রশ্নকর্তা-নারায়ন রায়, শিয়াল খাওয়া, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট।

উত্তর ঃ গ্রন্থ শিরোমনি শ্রীমদ্ভাগবতে 'রাধা' নাম নেই একথা সঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর যা বলেছেন তা শুনুন-'ভাগ্যহীন লোকগণ নানা প্রশ্ন করে ভাগবতে যখন রাধার নাম নেই, তখন গৌরসুন্দর ঐ নাম কোথায় পেলেন? কিন্তু আমরা বলি- কার জন্য থাকবে, বুদ্ধিকম লোকের জন্য থাকবে? মহাপ্রভু 'গোপী', 'গোপী' জপ করেছিলেন। সব নাম পাবে দেখা হলে।

কার নাম আছে? ললিতা, বিশাখা, রূপমঞ্জুরী প্রভৃতি কারও নাম নেই বলে তাঁরা কি কৃষ্ণপাদপদ্মের সেবায় পূর্ণাধিকার আমাদের মত নির্বোধের জন্য? নাম নিয়েই বা তারা কি করবে? সাধারণের পাঠের জন্য ব্যাস-শুকাদি ঐ নাম গোপন পাবেন' ঠাকুর মহাশয় অন্যত্র বলেছেন-ভাগবতে 'রাধিকার নাম বা গোপীর নাম বর্ণনা করেননি কেবল ক্রিয়াকলাপ বলেছেন মাত্র-ভোগী সম্প্রদায়ের ওটা জানা হলে, তারা অসুবিধায় পড়বে এইজন্য।'

প্রশ্ন ঃ কংসের ন্যায় অসুর যেমন শ্রীকৃষ্ণের প্রকট লীলায় শ্রীকৃষ্ণকে ধ্বংসে করার চেষ্টা করেছিল, অপ্রকট লীলায়ও কি সেইরূপ অসুররা শ্রীকৃষ্ণকে উৎপাত করবে?

প্রশ্নকর্তা-ডা. সুবেন্দু তালুকদার, গ্লাক্সো মোড়, খুলনা।

উত্তর ঃ প্রকট লীলায় যেমন অসুরের উৎপাত অপ্রকটলীলাতেও যদি অসুরের উৎপাত হয়, তবে কৃষ্ণের অসুবিধা হবে, কৃষ্ণ বিপদে পড়ে যাবেন, কোন সময় হয়ত অসুরেরা প্রবল শক্তিশালী হয়ে, বিপ্লব করবে, কৃষ্ণের ব্যাঘাত ঘটাবে, এরূপ আশংকা অপ্রকটলীলায় অর্থাৎ চিৎরাজ্যে নাই। অপ্রাকৃত রাজ্যে অসুর নিধন, অসুর বিমোহন লীলা নেই। সেখানে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছার ব্যাঘাতকারী আয়ান আদিরও অধিষ্ঠান নেই। চিৎজগৎ মায়িক বিক্রম এবং মায়া বর্জিত। 'যাহা কৃষ্ণ তাহা নাই মায়ার অধিকার।' শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছেন, এখানে যেমন চিত্র, তাতে বস্তুর অধিষ্ঠান নেই, সেখানে সেই প্রকার কংসাদি পুত্তলের আকার আছে, তাদের চেতনধর্ম নেই। ইহজগতে যেমন আমরা অর্চাতে অচিৎ-মিশ্র-দৃষ্টিতে চেতন ধর্ম দেখতে পাই না, তেমনই মুক্ত হলে সে জগতে অবরতা, হেয়তা প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ভগবানের প্রীতি সম্পাদক পাঁচ প্রকার ভৃত্য সেখানে পূর্ণ চেতনাবস্থায় আছেন। এখানে পাঁচ প্রকারের মিশ্র-চেতন ধর্ম-বিশিষ্ট ব্যক্তি কৃষ্ণকে বাদ দিয়ে অবস্থান করছে। সেখানে শুধু ভগবান ও তদাশ্রিত ব্যাপার।' আর শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ ভক্তিসন্দর্ভে বলেছেন, নিত্যলীলায় সেই সকল অসুর ধর্মাবলম্বী কৃষ্ণবিরোধী জিনিষগুলির অস্তিত্বে অচেতন মাত্র আছে।

প্রশ্নোত্তরদাতা- মনোজ কৃষ্ণ দাস
দিনাজপুর

সম্পাদকীয়

যথার্থ ব্রাহ্মণের গুণাবলী

বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ রয়েছে। এক শ্রেণীর মানুষকে বলা হয় অকামী, অর্থাৎ যাদের কোন রকম জড়-জাগতিক কামনা-বাসনা নেই। জড়-জাগতিক হোক বা আধ্যাত্মিক হোক, বাসনা অবশ্যই থাকবে। মানুষ যখন তার নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধনের আকাঙ্খা করে, তখন জড় বাসনার উদয় হয়। যিনি পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত, তাঁর বাসনা চিন্ময়। মহাত্মা নারদের উপদেশ ধ্রুব মহারাজ গ্রহণ করেননি, কারণ সমস্ত জড়-জাগতিক বাসনা নিরস্ত করার এই উপদেশ পালনে তিনি নিজেকে অযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু, এই কথা সত্য নয় যে, যাদের জড় বাসনা রয়েছে তারা পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা করতে পারবে না। ধ্রুব মহারাজের জীবন কাহিনীর এইটি হচ্ছে মূল শিক্ষা। তিনি স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তাঁর হৃদয় জড় বাসনায় পূর্ণ। তিনি তাঁর বিমাতার দুরুক্তির দ্বারা মর্মাহত হয়েছিলেন, কিন্তু যাঁরা পারমার্থিক মার্গে উন্নত, তাঁরা কখনও কারও নিন্দা অথবা স্তুতির পরোয়া করেন না।

ভগবদ্‌গীতায় বলা হয়েছে যে, যাঁরা প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত, তাঁরা জড় জগতের দ্বৈতভাবের দ্বারা প্রভাবিত হন না। কিন্তু ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছেন যে, তিনি জড়-জাগতিক সুখ-দুঃখের অতীত নন। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, নারদ মুনির উপদেশ অত্যন্ত মূল্যবান, তবুও তিনি তা গ্রহণ করতে পারেন নি। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে, জড় বাসনাগ্রস্ত ব্যক্তিরা ভগবানের পূজা করার যোগ্য কি না। তার উত্তর হচ্ছে যে, সকলেই ভগবানের পূজা করার যোগ্য। কারও যদি জড়-জাগতিক বহু কামনা-বাসনা থেকেও থাকে, তা হলেও তার উচিত ভক্তিসহকারে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করা, যিনি কৃপাপূর্বক সকলের বাসনা পূর্ণ করেন। এই বর্ণনা থেকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা থেকে কেউ বঞ্চিত নয়, হৃদয়ে যতই কামনা-বাসনা থাকুক না কেন।

বলা হয় যে, হৃদয় বা মন ঠিক একটি মাটির পাত্রের মতো, একবার তা ভেঙ্গে গেলে, তাকে আর কোন উপায়েই সারানো যায় না। ধ্রুব মহারাজ নারদ মুনিকে এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বিমাতার দুরুক্তিরূপ বাণের দ্বারা তাঁর হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় তা এমনই মর্মাহত হয়েছে যে, সেই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার বাসনা ছাড়া আর কোন কিছুতে তাঁর রুচি নেই। তাঁরা বিমাতা তাঁকে বলেছিলেন যে, যেহেতু মহারাজ উত্তানপাদের অবহেলিত রাণী সুনীতির গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল, তাই ধ্রুব মহারাজ রাজসিংহাসনে অথবা তাঁর পিতার কোলে বসার উপযুক্ত ছিলেন না। অর্থাৎ, তাঁর বিমাতার মত অনুসারে, তিনি রাজা হওয়ার যোগ্য ছিলেন না। তাই ধ্রুব মহারাজ দেবশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার পদ থেকেও উচ্চতর লোকের রাজা হওয়ার সংকল্প করেছিলেন।

ধ্রুব মহারাজ পরোক্ষভাবে মহর্ষি নারদকে জানিয়েছিলেন যে, চার প্রকার মানবোচিত মনোভাব রয়েছে-ব্রাহ্মণোচিত মনোভাব, ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব, বৈশ্যোচিত মনোভাব এবং শূদ্রোচিত মনোভাব। এক বর্ণের মনোভাব অন্য বর্ণের মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। নারদ মুনি যে দার্শনিক মনোভাবের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা ব্রাহ্মণের উপযুক্ত হলেও ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত নয়। ধ্রুব মহারাজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছিলেন যে, তাঁর মধ্যে ব্রাহ্মণোচিত বিনয়ের অভাব ছিল, এবং তাই তিনি নারদ মুনির দর্শন স্বীকার করতে অক্ষম ছিলেন।

ধ্রুব মহারাজের উক্তিটি ইঙ্গিত করে যে, শিশুকে যদি তার প্রবৃত্তি অনুসারে শিক্ষা না দেওয়া হয়, তা হলে তার পক্ষে কোন বিশেষ মনোভাব বিকশিত করা সম্ভব নয়। গুরুদেব বা শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে, বিশেষ বালকের মনোবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে তাকে বিশেষ বৃত্তি অনুসারে শিক্ষাদান করা। ধ্রুব মহারাজ ইতিমধ্যেই ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব অনুসারে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর পক্ষে ব্রহ্মণ্য দর্শন গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। আমেরিকায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাবের বৈষম্যের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। যে-সমস্ত আমেরিকান বালকেরা শুদ্রোচিত শিক্ষালাভ করেছে, তারা রণভূমিতে যুদ্ধ করার উপযুক্ত নয়। তাই, যখন তাদের সেনাবাহিনীতে যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাদের মনোভাব ক্ষত্রিয়োচিত নয়। সমাজে এটিই হচ্ছে মহা অসন্তোষের কারণ।

বালকদের ক্ষত্রিয়োচিত মনোভাব না থাকার অর্থ এই নয় যে, তারা ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীতে শিক্ষিত হয়েছে, তাদের শূদ্রের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে নিরাশ হয়ে তারা হিপি হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু, তারা শুদ্রত্বের সর্ব নিম্নস্তরে অধঃপতিত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী লাভের শিক্ষা প্রাপ্ত হচ্ছে। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের দ্বার সকলেরই জন্য খোলা রয়েছে, তাই সকলেই ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলী অর্জন করতে পারে। বর্তমান সময়ে এটি সব চাইতে বড় প্রয়োজন, কারণ এখন প্রকৃতপক্ষে কোন ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় নেই, কেবল রয়েছে কিছু বৈশ্য, আর অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে শূদ্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র-এই চারটি বর্ণে সমাজকে বিভক্ত করার পন্থাটি অত্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত। মানব সমাজরূপ শরীরে ব্রাহ্মণরা হচ্ছেন মাথা, ক্ষত্রিয়রা বাহু, বৈশ্যরা উদর এবং শূদ্ররা পা। বর্তমান সময়ে সেই শরীরটিতে পা রয়েছে আর উদর রয়েছে, কিন্তু তাতে মাথা নেই অথবা বাহু নেই, এবং তাই এই সমাজের সব কিছুই ওলটপালট হয়ে গেছে। এই অধঃপতিত মানব-সমাজকে আধ্যাত্মিক চেতনার সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত করার জন্য ব্রাহ্মণোচিত গুণাবলীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।
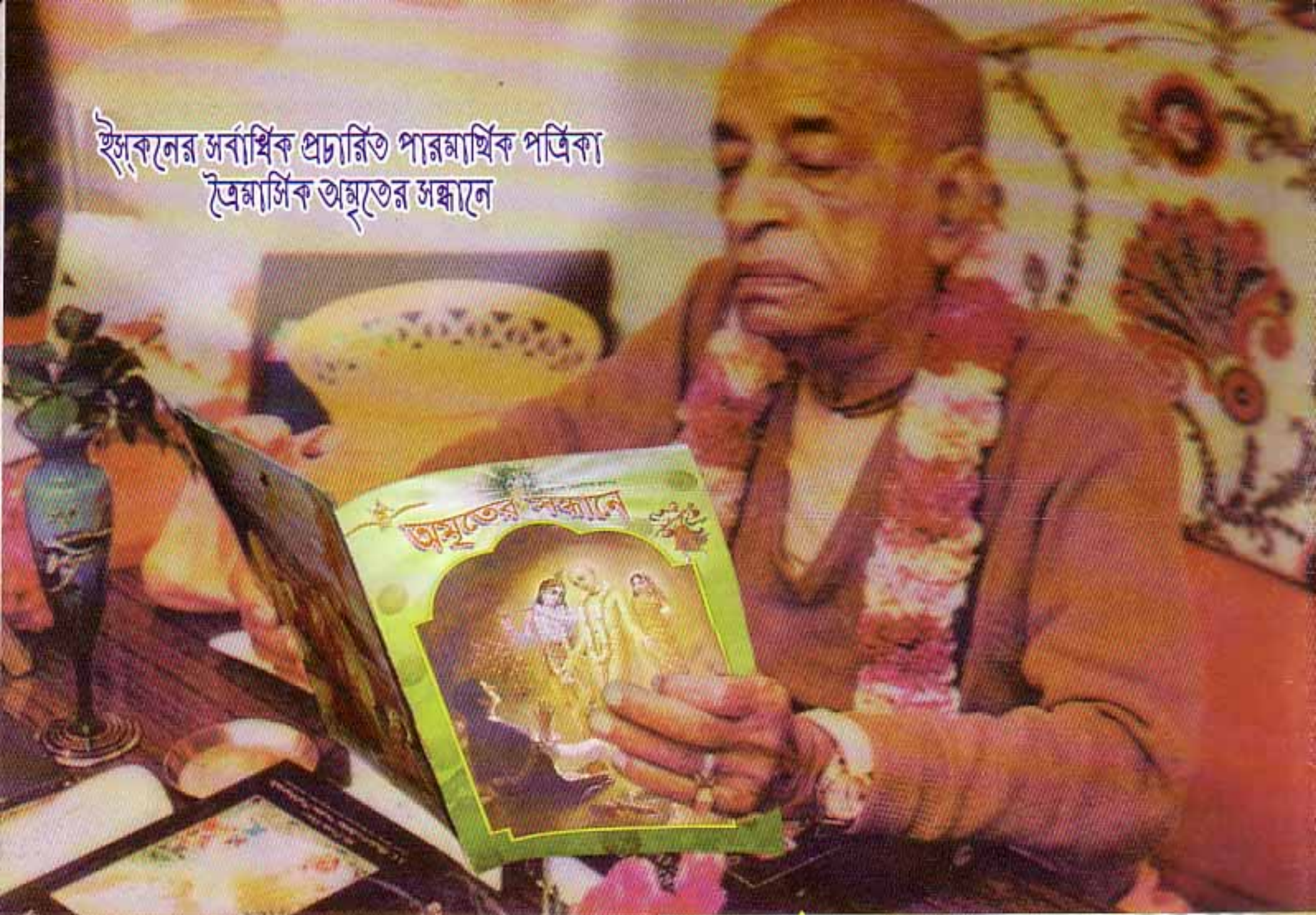
ইস্‌কনের সর্বাধিক প্রচারিত পারমার্থিক পত্রিকা
ত্রৈমাসিক অমৃতের সন্ধানে
অমৃতের সন্ধানে
ইস্‌কনের ত্রৈমাসিক পত্রিকা —
অমৃতের সন্ধানে
পত্রিকাটির গ্রাহক হয়ে মানব জীবনকে ধন্য করুন
অমৃতের সন্ধানে